বুনো রাতের রজনীগন্ধা

প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন

প্রকাশকঃ

দেওয়ান আবদুল বাসেত

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ
রিয়াদ, সউদী আরব।

প্রকাশকালঃ

ইন্টারনেট সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩বাঙলা
জুন ২০০৬ইং

গ্রন্থ স্বত্ত্বঃ লেখক

প্রচ্ছদঃ
কম্পিউটারে বাঙলা কম্পোজঃ
আসিফ ইসলাম
লুবনা বাসেত বৃষ্টি
জেকরা বাসেত নদী

প্রকাশনার ২০ বছর

সকল যোগাযোগঃ

Email:

marupalash@gmail.com
rupashee.chandpur@gmail.com
mohona.mohona@gmail.com

website :

www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur www.geocities.com/mohona_riyadh

মরুপলাশ কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

লেখকের দেয়া নাম ছিলো

ইতিহাসের বাঁক বদলে চাঁদপুর নামের জনপদ

মরুপলাশের দেয়া নাম...

ইতিহাসে চাঁদপুর (১)   ইতিহাসে চাঁদপুর (২)

মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর ১-২-৩

অনুভবে স্বদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ (কাব্যগ্রন্থ)

বুনো রাতের রজনীগন্ধা

প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন

(এই গল্পটি অন্যসব গল্পের মত গল্পহীন কোন কাহিনী নয়। সত্যি ঘটনার একটি বর্ণনা মাত্র। দরী ও হৃদয় লেখকের বন্ধু। সকল গল্পে তিনি তাদের খুঁজে পান। সত্য ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পের অবয়বে লেখক কল্পনার কিছু ছোঁপ একেঁ দিয়েছেন। হৃদয় আর মন্দোদরীকে আমাদের সমাজে খুঁজে পাওয়া খুবই সম্ভব। তারপরও এ সকল বর্ণনা শুধুই লেখার প্রয়োজনে। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ তারা যেন গল্পটিতে কোন বাস্তবতার মিল না খোঁজেন। **....লেখক**

প্রকাশকের বক্তব্য

উপরের বক্তব্যগুলো ছিলো লেখকের। তিনি একে গল্প বলেছেন। আমি বলবো মিনি উপন্যাস বা বড় গল্প। তাতে আমাদের সমাজের চৌহদ্দিতে যে সকল বিষবাস্প লুকিয়ে আছে, তাই তিনি তার কলমের আঁচড়ে তুলে এনেছেন। বলেছেন অনেক সাহসী নিরেট সত্য কথাও। এমন সত্য বলার লোকজনইতো এই ঘুণেধরা সমাজে বিরল। উত্তম পুরুষে বর্ণিত মিনি উপন্যাসের এটি ১ম পর্ব। মরুপলাশ এর পাঠক বন্ধুদের জন্যে প্রকাশ করা হলো।

বুনো রাতের রজনীগন্ধা

চারদিকে অথৈ পানি, শহরের সব রাস্তাগুলো এখন নদীতে পরিণত হয়েছে। একটু আগে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। বর্ষণ থামার পর মাথার ওপর শুধু নীল আকাশ, ভূমি শান্ত সমাহিত। ফর্সা স্ফটিক স্বচ্ছ পানি সর্বত্র। মিশন রোড ধরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো আমাদের গাড়ি। খানা-খন্দক আর চোরা গর্তের ভয়ে ড্রাইভার খুবই সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে আরেকটি গাড়ি, আমাদের কাছে এসে অতিক্রমের কারণে গাড়িটির গতি একবারেই মন্থর হয়ে এলো।

তাকিয়ে দেখলাম যানটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার। দামী গাড়ি শীতাতপনিয়ন্ত্রীত কাঁচ নামানো না থাকলে ভিতরে কে আছে দেখা সম্ভব নয়। আমাদের গাড়ির চালকের মতই সতর্ক ও গাড়ির চালক। মন্থর হতে হতে পাশা পাশি এসেই গাড়ি দু'টির গতি সীমা শুন্যতে নেমে যায়। পথের অবস্থা খারাপ তাই আরোহী গাড়ির কাঁচ নামিয়ে রেখেছে। আমি ওদের গাড়িটি ভালো করে অবলোকন করি।

পেছনের আসনে চোখ পড়তেই হঠাৎ করেই আমার সমস্ত পৃথিবী নড়ে ওঠে আমি অবাক বিস্ময়ে নিস্পলক তাকিয়ে থাকি। পৃথিবীর সকল রঙ, সকল সুন্দর অনুভবগুলো ওখানে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। এ আমি কাকে দেখছি - প্রায় এক যুগ পরে আমার হৃদপিন্ডের গতি অতিদ্রুত হয়, আলোর স্ফূরণ আমি উপভোগ করি। আমার সকল পিপাসা একত্রিত হয়। অতিদ্রুত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে একসময় দুটো যন্ত্র চালিত যান দু'দিকে চলে যায়। যে নারীর মধু প্রেম আমার রক্তের প্রতিটি ফোঁটায় অনির্বচনীয় শিহরণ যোগায়, তাকে নিয়ে হৃদয়হীন যন্ত্রদানবটি অতিদ্রুত আমাকে অতিক্রম করে চলে গেলো। আমি শুধু নির্বাক হয়ে রইলাম। আবেগ যেখানে প্রবল ভাষা সেখানে মুক, কথাটি আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম।

অকস্মাৎ প্রাপ্তির নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে আমি ক্ষণকাল চোখ বন্ধ করে ছিলাম। চোখ খুলতেই দেখলাম অপসৃত হয়েছে সকল সুন্দরের উৎস আমার আরাধ্য নারীটি। নির্মেঘ আকাশ আবার কাজল রং ধারণ করলো। ভারী হয়ে এলো আকাশের শরীর। কামনার নারীটির দোলায়িত নিতম্বের মত দুলতে দুলতে আকাশ এক সময় বর্ষণ শুরু করলো। সকল আলো নিভে গেলো। হয়ে এলো সমস্ত পৃথিবী আধাঁর। ভারী বর্ষণে পৃথিবীর উদর স্ফীত হলো। বন্যা ক্রমেই বেড়ে চললো। আমার মনে হলো বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো আমার চোখের জলে বন্যার শরীর আরো ভরাট হয়েছে। পৃথিবী এখন পোয়াতি নারীর মতো। পানির ভারে টালমাটাল ও দুর্বল। বিগত কয়েকটি বছর ধরে ওর কোন খবর আমি জানি না। খুব কষ্ট করে হলেও ইচ্ছে করেই ওর সাথে যোগাযোগ বন্ধ রেখেছি আমি। আজ এক পলকের একটু দেখায় আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠলো। আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।

ফিরে এলাম আমার আবাসস্থলে। নির্ঘুম আরেকটি রাত এক সময় শেষ হলো। যামিনি শেষ হতে আর বেশি দেরী নেই। এক দুর্ণিবার আর্কষণ মনে করিয়ে দিলো সেই চিত্তহারী দরীর কথা-কত রূপে সে আমার জীবনে বিদ্যমান। আজ তা বর্ণনার কোন অক্ষর বা শব্দ আমার জানা শব্দ কোষে নেই । দেখা হলো বক্ষ বিদীর্ণ হলো অথচ উচ্চারণ করতে পারলাম না দু' অক্ষরের মধুর নামটি। গাড়ির গাায়ে অঙ্কিত সংস্থাটির নামের সূত্র ধরে হয়তো জানতে পারবো দরীর বর্তমান অবস্থানের কথা, এইটুকু শান্তনা। বিগত রাতটি একই শহরে একই আকাশের নিচে আমাদের কাটলো। একই বাতাস থেকে সংগ্রহ করা জীবনী শক্তি রক্তকে

সচল করলো অথচ আবেগ রইলো অচঞ্চল। আবাল্য বন্ধু মোর, পাশের বাড়ির মেয়েটি। গত একটি যুগ ওকে দেখিনি। যদিও জীবনের প্রতিটি শ্বাসে অনুভব করেছি তার অস্তিত্ব।

এক দুরন্ত ঝড় সুস্থির সমুদ্রের স্রোতকে প্রচন্ডভাবে নাড়াচ্ছিলো। গতকাল দরীকে দেখার পর জীবনের স্রোত আবার উল্টো দিকে বইতে শুরু করে। আমার ফেলে আসা শৈশব, দুরন্ত কৈশোর, সোনালী যৌবন কথা বলতে শুরু করে। একই গাঁয়ে অভিন্ন ভিটায় বড় হয়েছি আমরা দু'জন। ভিন্ন ধর্মের দুটো পরিবার, অথচ শেকড় একই মাটিতে প্রোথিত। আমি হৃদয় চৌধুরী আর মন্দোদরী দু'টি পরিবারের দু'জন প্রতিনিধি। পরিবার দ'ুটো আজ হিন্দু মুসলিম পরিচয়ে অভিসিক্ত। অথচ দূর অতীতে যাত্রা শুরু করেছিলো অভিন্ন উৎস স্থল থেকে । সময় কাল স্থান ভেদে পরিচয় কোথাও এক আবার অনত্র ভিন্ন।

ছোট বেলায় পারিবারিক আলাপ আলোচনায় জেনেছি সাত পুরুষ আগে আমাদের পরিবারের এক অংশ কোন এক মুসলিম সাধকের সংস্পর্শে এসে ধর্মান্তরিত হয়েছিলো। যদিও বাড়ির পরিচয় আজো ঠাকুর বাড়ি রয়ে গেছে। এলাকার লোকজন বলে বড় ঠাকুর বাড়ি। বাড়ির সম্মুখ ভাগে রয়েছে একটি সুরম্য সুন্দর মসজিদ, যা বাংলার মোগল শাসক শাহ সুজা তিনশত বিশ বছর পূর্বে নির্মাণ করেছেন বলে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়। অত্যন্ত অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে মসজিদের সম্মুখে রয়েছে একটি প্রস্তর নির্মিত একক পাথরের বেদী। বেদীটির মাঝ বরাবর আয়তকার একটি গর্ত, সেখানে হয়তো কোন তুলসী গাছ ছিলো। এটি হয়তো কোন তুলসী মঞ্চ। বেদীটির চার পাশে কিছু মূর্তি উৎকীর্ণ বিষ্ণু এবং অন্য দেবতাদের। কোন এক সময় ওখানে পুজোঁর অর্ঘ্য দিতেন ঠাকুর বাড়িটির কোন গৃহবধূ অথবা অন্য কেহ। দরীদের বাড়িটির পরিচয় ছোট ঠাকুর বাড়ি হিসেবে।

দু'পরিবারের পূর্ব পুরুষরা ব্রাহ্মণকুলের জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। আমাদের বাড়ির পুরণো আসবাবপত্র, তামার তৈজসপত্র ও আচার আচরণ সকল কিছুর মাঝেই ছোট বেলায় আমি পাশের বাড়ির সাথে কেমন যেন একটা মিল খুঁজে পেতাম। ওদের সাথে আমাদের ধর্মছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে ভিন্নতা খুবই কমছিলো। শুনেছি কোন এক কালে আমরা পরস্পর আত্মীয় ছিলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু বদল হয়নি। দু'টো পরিবার আজ দু'ধর্মের হলেও কোথায় যেন একটা অদৃশ্য গ্রন্থি এখনও বিদ্যমান। অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ এর কারণে আমি আর মন্দোদরী দু'জনের কাছে আসতে খুব একটা সময় লাগেনি। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বাঁধাও অতিক্রম করতে হয়নি। দরীর বাবার নাম আর আমার বাবার নামের উচ্চারণ ভিন্ন দু'টি ভাষা হলেও শাব্দিক অর্থ একই ছিলো। দরীর বাবার নাম উচ্চারিত হতো বাংলাভাষায় আর আমার বাবার নাম উচ্চারিত হতো আরবী ভাষায়। আমাদের পারিবারিক পদবী পন্ডিত, ওদেরও তাই। ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া সংস্কার ও কৃষ্টিতে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষণীয় ছিলো না। পারস্পরিক সম্বোধনেও আমি কোন ভিন্নতা দেখিনি। কাকা, মামা, জেঠা, দাদু, মা, কাকী সব সম্বোধন গুলো একই প্রকার।

আমার ডাক নাম হৃদয়, শুনেছি নামটি রেখেছিলেন কাকীমা, এই নাম রাখার বিষয়টি আমাদের পরিবার সহজভাবে গ্রহণ করেছিলো। ১৯৪৭ এ দেশভাগ হওয়ার পর পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক স্বচ্ছল ও শিক্ষিত অংশ, বিশেষ করে সরকারি চাকুরীরত লোকজন ও তাদের পরিবার দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। সে সময় আমাদের গ্রামের অবস্থা ছিলো ভিন্নরূপ। ১৯৬৫ সনের পূর্বপর্যন্ত গ্রামের সামাজিক কাঠামোতে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যার হার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনি। মন্দির বা মসজিদ নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি আমাদের গ্রামের সামাজিক ব্যবস্থায় ছিলো না। হিন্দু মুসলিম দু'সম্প্রদায়ের লোকজন সমঅধিকার নিয়েই আমাদের সোনারং গ্রামে বসবাস করতো। রজত

রেখা নদীর পানি তখনও স্বচ্ছই ছিলো। আমার মনে আছে ১৯৬৫ সনের যুদ্ধের প্রাক্কালে পার্শ্ববর্তী নারায়নগঞ্জে খানিকটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিলো। দরীর কৃষ্ণা পিসি ও আরাধনা মাসি নিরপত্তার কারণে আমাদের বাড়িতে থাকতো। ওরা তখন বুঝতেও পারেনি আমাদের পরিবার আলাদা ধর্মের কোন গোষ্ঠি।

আমার দাদু ব্রিটিশভারতে রাজকর্মচারী ছিলেন। ফলে গ্রামে আমাদের শিকড় প্রোথিত থাকলেও আমার বাবা কাকারা অনেক পুর্বেই শহরবাসী হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে আমরা গ্রামে যেতাম বিশেষ করে রাজনৈতিক বা অন্য কারণে শহরে নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হলেও আমরা বসবাস করার জন্য গ্রামে যেতাম। ১৯৭১ সনে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে, দরীদের পরিবার অন্য অনেকের মতো ভারতে শরনার্থী হয়। পরবর্তী সময়ে আমিও ভারতে গিয়ে ওদের সাথে মিলিত হই। সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরে যাওয়ার পুর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ওদের সাথেই শরণার্থী শিবিরে থাকি। তখন একবারও মনে হয়নি আমি পরিবারের বাইরে আছি। দেশ স্বাধীন হলে দরীরা সকলের মত পোড়া ভিটে মাটিতে ফিরে আসে। ওদের অবস্থা এমনিতেই খারাপ ছিলো। পরিবারের কর্তাটির এলোমেলো জীবন যাপন পরিবারটিকে লক্ষ্মীর কৃপা বঞ্চিত করে রেখেছিলো। বাস্তুচ্যুত হওয়ার কারণে সদ্য স্বাধীন দেশে ওদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী তিন চার বছর ওরা গ্রামেই ছিলো।

পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তার অভাবে বাড়িঘর বিক্রি করে মন্দোদরীর পিতা সত্যকাকু নারায়নগঞ্জ শহরে ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেন। এভাবেই মন্দোদরীরা নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে যায়। ওদের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হতে থাকে। তখনও আমি ওদের সাথে আমার সম্পৃক্ততা বজায় রাখি। অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে ভাগ করার চেষ্টা করি ব্যাথা আর বেদনা। সুখ দুঃখে হয়ে থাকি একাকার। দরী, দারুন কষ্ট আর সীমাহীন অনটনের মধ্যে স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে, একটি চাকুরী জোগাড় করে। স্নাতক আর স্নাতকত্তোর ডিগ্রী চাকুরীরত অবস্থায়ই লাভ করে। ওর তিন বছর আগে পড়া শোনা শেষ করে আমি পেশাগত জীবনে প্রবেশ করি। পরিবাটির সাথে আমার যোগাযোগ তখনও অব্যাহত ছিলো। কাকীমা প্রায়ই বলতেন 'হৃদয়, পুর্বজন্মে আমার ছেলে ছিলো।' আমার প্রথম জীবনের অর্জিত অর্থ আমি আমার পরিবার পরিজন ও দরীদের পরিবারের জন্য সমভাবে ব্যয় করার চেষ্টা করি। দরী পড়া লেখা শেষ করে একটি ভালো চাকুরী পাওয়া পর্যন্ত আমার চাকুরী জীবনের প্রায় অর্ধযুগ সময় ব্যয় হয়ে যায়। আমার তখন ২৮ বছর চলছে দরীর পঁচিশ। এবার আমি যৌথ জীবন যাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি।

একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় মন্দোদরী আমাকে জানায় ওর পড়াশোনার পাঠ শেষ হয়েছে। কিছুদিন বৃদ্ধ বাবার সংসার এর হাল ধরার খুব ইচ্ছে তার। তাই কিছুদিনের সময় চায় দরী। আমার আপত্তি করার কিছু ছিলো না। আমরা জানতাম যতই সংস্কার মুক্ত মনের মানুষ হোক আমাদের পরিবারের সদস্যরা দরীর আর আমার বিয়ে মেনে নেবে না। তাই ওদের পরিবার একটু সচ্ছল হলেই আমরা কোর্টে গিয়ে বিয়ে করব সিদ্ধান্ত নেই। এভাবে আরো দু'টি বছর অতিক্রান্ত হলো। সময় অতিদ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে বদলে যাচ্ছে সামাজিক বিন্যাস। আলগা হয়ে আসছে বোঝা পড়ার গ্রন্থি। নানাহ কথা শুরু হয়ে যায়। ওর আর আমার স্বজনরা আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। ধর্মকে নিয়ে আসা হয় সামনে। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা গৌণ হয়ে যায় মুখ্য হয় ধর্ম। তবুও আমাদের জীবন বয়ে চলে। আমি-দরী দু'জনই অনড় থাকি, আমাদের জীবন নিয়ে। কিন্তু প্রেক্ষাপট বদলাতে থাকে। সময় যতো পুরণো হতে থাকে নতুন সমস্যা এসে হাজির হয়।

জীবনতো আর মসৃন মার্বেল পাথরের তৈরী মেঝে নয়। উলের বল গড়িয়ে দিলেই চলবে। ঘাত- প্রতিঘাত আর অভাব অনটন আমাদের একত্রিত হওয়ার সময়টাকে বিলম্বিত করে। আরেকটু স্বচ্ছলতার জন্যে ও একটি বিদেশী বেসরকারি সংস্থার চাকুরী নিয়ে উত্তরবঙ্গে চলে যেতে চায়। যাবার আগে কোর্টে গিয়ে রেজিস্টার করে বিয়েটা শেষ করতে বলে। ততদিন জীবনের স্রোত উল্টো দিকে বইতে শুরু করেছে। সময়ে নানা অনর্থ ঘটে যেতে থাকে। যেমন আমার বাবার স্বাস্থ্য সমস্যা, সত্য কাকার উড়নচন্ডি স্বভাব, কাকীমার অপরিমেয় স্নেহের কথা চিন্তা করে আমি একটা কিছু করতে বিশেষ করে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করতে দমে যাই। দু'টো পরিবারের কাঠামো ভাঙ্গাতে আমার সীমাহীন কষ্ট হয়। আমি ভয় পেয়ে যাই। কাকীমা কত দিন কত জনের কাছে বলেছেন 'আগের জন্মে হৃদয় আমার ছেলে ছিলো' এ কথাটির মূল্য পরিশোধ আমার জন্য কষ্টকর দায় হয়ে পড়ে। আমার আর দরীর বিয়ে আর হয়ে উঠেনি। এর পরও দরী আমি একত্রিত হয়েছি। ভালোবেসেছি পাগলের মতো একে অপরকে। আজ যখন ঘর বাঁধার সময় হলো তখন দরী সাহসী হলেও, বর্ণিত কারণ সমুহের কবলে পড়ে আমার সকল সত্ত্বা ভীরুতায় আক্রান্ত হলো।

আমি সাহসী হতে ব্যর্থ হলাম। সমাজ সংসার আর ভীরুতার জন্যে আমার লড়াকু ও বেপরোয়া মনোভাবের ঘাটতি শুরু হলো। ওকে আমার জীবনের সাথে জড়াতে পারলাম না। শুধু একটি সাহসী সিদ্ধান্তের জন্যে সমাজ স্বীকৃতি স্বামী স্ত্রীরূপে একত্রে ঘর সংসার করা হয়ে উঠেনি দু'জনের। ভাঙ্গা মন নিয়ে পোড় খাওয়া মন্দোদরী অনেক অভিমানে এ সময় অন্যের গৃহিনী হয়ে যায়। আজ মনে পড়ে ও একদিন এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আমাকে বলেছিলো, রাবনের রামভক্ত স্ত্রীর নাম মন্দোদরী তাই হয়তো আমাকে এ যুগের কোন নবরাবনের গলায়ই মালা দিতে হবে। হয়তো আমার নিয়তিও রাবনস্ত্রীর মতোই হবে অথবা আমি নষ্ট হয়ে যাবো। আমি তখন ভিন্ন কথা বলেছি।

ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর আবর্তনের সাথে তাল মিলাতে মিলাতে একসময় আমরা দুরের মানুষ হয়ে গেলাম। প্রথম বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাত বছর পর একসময় একটি জেলা শহরে দেখা হয়ে গেলো দু'জনের। প্রথম দেখায় ওর সিঁথিঁর সীমান্তে কারো মঙ্গল কামনায় সিদুঁর চিহ্ন রয়েছে কিনা খুঁজে দেখলাম আবিস্কার করলাম বিন্দুগণ থেকে চিত্তকে অবাক হয়ে দেখালাম। হাতের শঙ্খল শাঁখা গুলোও সোনার পাতে এমনভাবে মোড়া হঠাৎ করে চোখে পড়ে না। তারপরও এখন সে পরের স্ত্রী। আগের মতোই সুন্দরী রয়েছে ও বরঞ্চ শরীরের কিছু অংশ স্ফীত হওয়ার কারণে আরো আকর্ষণীয় হয়েছে। দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার পর মাস খানেক দুরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পানি যেমন সুক্ষ্ম ছিদ্র পথ অনুসন্ধান করে নিজ চলার পথ তৈরী করে নেয় তেমনি দুর্নিবার এক আকর্ষণ আস্তে আস্তে আমাদের পুর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

এবার আমরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠি। ভুলে যাই ঘর সংসার, আশে পাশের সমাজ স্বজনকে। দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার পর আমরা অতিক্রম করি চারটি বছর কেমন করে কোথা দিয়ে শেষ হয়ে গেল এই মধুর সময়গুলো বোঝাই গেল না। কোন প্রকার নীতিকথা বা সমাজের রক্তচক্ষু আমাদের নবায়ন করা সম্পর্কে চিড় ধরাতে পারেনি। শরীরের সকল ভূগোল পাঠ থেকে শুরু করে আবেগের মূল্যবান নির্যাষগুলো কেবলই আনন্দ আর সোনালী আলোতে ভরে ছিলো। দু'জনের কাঙ্খিত সময়গুলো মধুর থেকে মধুরতম হয়ে ওঠলো। ওর মন উঠলো স্বামীতে, আমি ভুলে গেলাম সমাজ সংসার। প্রভাতের সূর্য রাতের চন্দ্র কখন উদিত হয় আবার অস্তমিত হয় তখন আমরা টের পেতাম না। আজ মনে পড়ছে চারটি বছরের অনেক আবেগঘন মুহূর্তের কথা। তারই মাঝে আনন্দঘন একটি দিনের কথা- সেদিন প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে কেন

যেন মনে হলো আজকের দিনটি শুধুই আমার জন্যেই তৈরী হয়েছে। সেদিন মেজাজ ছিল ফুরফুরে। দ্রুত সব কাজ শেষে করে দুপরে সবার লক্ষ্যেই দরীর বাসায় এলাম। দরজায় টোকা দিতে অতি চেনা শব্দ শুনে, দ্রুত দরজা খুলে দিলো দরী। তার চেয়ে বেশি দ্রুত আমাকে ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। ঘরের বন্ধ জানালার ওপাশে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে তখন। তারই সাথে অনেক দিনের পুরণো আর চেনা একটা গন্ধ নাকে এসে লাগছে আমার। যে গন্ধের সাথে আমার পরিচয় জন্মজন্মান্তরের। হাতে তোয়ালে নিয়ে অতি নিপুণ আর পরম যত্নে আমার মাথাসহ মুখটা মুছে দিলো দরী। বলল কাপড় বদলে নাও।

পোষাক বদল করে আমি স্প্রিঙের মতো ঘুরে দাড়াতেই দরী পাশের খাটে পড়ে গেল সটান। পড়েই আমাকে আবিস্কার করলো নিজের ওপর। এই কি করছ। পাগল হয়ে যাচ্ছ তুমি রাধার নামে মেয়েলী আহ্বান। কথা বলার উপায় ছিল না আমার। ওর গলায় ঠোঁট ঘষতে ঘষতে নেমে এলাম আরো নিচে। দরীর গলায় সোনার হারে ঝোলানো লকেট ঘুরে চলে গেছে কাঁধের দিকে। আবিস্কার করি লকেটটি আমারই দেয়া। সযত্নে এটি এখনও কণ্ঠে ধারন করে আছে আমার প্রিয়া লকেটটি আমার কার্যক্রমের দ্রুততর করেছিলো। শাড়ির আঁচল পড়ে রয়েছে বিছানায়। ওর অবয়বে তৃষ্ণার্থ অধর আমার। অনেক নিচে নেমে এসেছি আমি। এসব জায়গা এত নরম নিজের ঠোঁটকে বিশ্বাস হতে চায় না। প্রথম হুকটা খুলতেই আমার হাতটাকে থামিয়ে দেয় দরী। হঠাৎ প্রশ্ন করে আমার প্রিয়তমা, হৃদয় এখনো আমাকে তোমার ভালো লাগে? উত্তর না দিয়ে শুধু বলি আমি তোমাকেই চাই, তোমাকে আজ সম্পুর্ণ দেখতে চাই। আমার জান, কতদিন দেখিনি তোমায়। দ্যাখো বলেই চোখ বুজে ফেলল রাবনবঁধু মন্দোদরীর কলির সংস্করণ দরী। ততক্ষণে পোষাকের খোলস থেকে ওকে বের করে এনেছি আমি।

দু'টো জানালার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো আসছে ঘরের মধ্যে তাতে মনে হচ্ছে মোম দিয়ে তৈরী কোন মূর্তি শোয়ানো রয়েছে শয্যায়। নখ দিয়ে সামান্য আঁচড় দিলেই গভীর দাগ বসে যাবে। দরীতে মত্ত হয়ে মৃদু আঘাত করি আমি। দরীর কোলে মাথা রেখে শয্যায় গা এলিয়ে দিলাম আমি। দরীর মুখ নেমে এলো আমার অধরের কাছে তপ্তশরীরে অগ্রাসনের কাছে আত্মসমর্পণ। একরাশ খোলা এলো চুল ঝাঁপিয়ে পড়ে আড়াল করে দিলো পৃথিবীর অন্যসব রঙ। কানে বৃষ্টির মধুর শব্দ আসছে রিমঝিম, রিমঝিম। আমি ঠোঁট দিয়ে মোমের তৈরী শরীরটির গলা-বুক ভিজিয়ে দিতে শুরু করি। প্রেয়সি দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে নিয়ে বিড় বিড় করে বললো আমি মরে যাবো, খুন হয়ে যাবো। পর মুহূর্তে আস্বস্ত করলো আমায় হৃদয়, আমরা কোন অন্যায় করছি না। এ মহূর্তে কোন পাপও নেই আমাদের। আমি আবার সেই চিরমাদকতাময় গন্ধটাই পাচ্ছিলাম। দরীর শরীরের সেই মিষ্টি গন্ধটা তখন ছড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির শরীর বেয়ে। সমগ্র পৃথিবী তখন আনন্দময়। একসময় সাগর মন্থনে সকল অমৃত উঠে এলো। পড়ে রইলো হলাহল। ক্লান্ত আমি উঠে দাঁড়ালাম। সুস্থির হয়ে বললাম- আজ চলি। দরী তড়িৎ উঠে বসলো বললো- না তুমি যাবে না। আজ তোমার জন্যে আমি রাঁধবো। খেয়ে যাবে তুমি। আমি ঘরের আলো জ্বেলে দিলাম। এ কি করছো? আমি এই অবস্থায়! বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে খাটের ওপর পড়ে থাকা শাড়ি সায়া ব্লাউজ গুটিয়ে নিয়ে বুকের কাছে আড়াল করে ধরল দরী। কপট রাগ দেখিয়ে বলল- চোখ বন্দ করো।

আমি বললাম পরো না কিছু, অনাবৃত পুষ্পই দেবতার কাম্য। এসো আমার পাশে। **তুমি আমার বুনো রাতের শুভ্র রজনীগন্ধা।** আবরণে ঢেকোনা নিজেকে। তখন আমার সম্মুখে শ্বেত পাথরে গড়া গ্রীক দেবী ভেনাসের অপরুপ মূর্তি । সম্পূর্ণ নগ্ন। ক্ষীণ কটিদেশ টানা টানা চোখ সুগঠিত স্তন পাঁচফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার মন্দাদরী । সোনালী তটে এখনও সাদা মুক্তোর মতো স্বেদ বিন্দু। বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি। চাইনা স্বর্গ, চাইনা মর্ত্য, তোমাতে মুগ্ধ আমি।

না আমি পারবো না আমার লজ্জা করে না, দরীর কপট উত্তর। বিমুগ্ধ নয়নে উপভোগ করি আমি বাঞ্ছিত কপটতা। হ্যাঁ এর উত্তর যখন না হয়, তখন সেই নাকে ভাঙ্গার আনন্দে আমি বিভোর হই। ..আমি চলে যাওয়ার আগে নয়ন ভরে তোমাকে আর একবার দেখতে চাই।

না, দেখনি তুমি আমায়? নতুন করে আর কি দেখবে? চাঁদের কলংক দেখে তৃপ্ত হতে চাও? আমি মনে মনে ভাবি, হে নারী কে বলে তোমায় কলংকিত! তুমি দেবী। কান্তা তোমাতে মরেছি আমি।
তাহলে আমি চলে যাচ্ছি দরী। চোখ তুলে তাকায় আমার শত প্রিয়সী ঠিক নাটোরের বনলতাসেনের মতো।

এভাবে যেতে পার না তুমি। আমি তোমাকে যেতে দেবো না। আজ তুমি এখানেই থাকবে। কত অধিকার নিয়ে উচ্চারিত এই কথাগুলো। আমি বিমোহিত।
আমায় ক্ষমা করো দরী, তোমায় কিছু দেওয়ার অধিকার আমি ইচ্ছে করেই হারিয়েছি। তোমারও কি কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আছে আজ? ভীরু, সুবিধাভোগী লোকটিকে ক্ষমা করে দাও। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না।

হু হু করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আমার শত জনমের সাথী।
আমার কাছে ক্ষমা চেয়ো না হৃদয়।
দরী আমার কাঁধে হাত রাখে। এই শরীরেই আমি আটকে গেছি দ্যাখো। হৃদয়, শরীর দিয়েও তো অনেকে আটকাতে পারে? আমি পারিনি কেন? চলে যেও না তুমি। আমি আবার একা হয়ে যাবো। তুমি শুধুই আমার। আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কিছু চাই না। পেছনের দুর্বিষহ দিনগুলো ভুলে যেতে চাই। আমার আরাধ্য দেবী, পরিতৃপ্ত নারীর এই সর্বগ্রাসী আহ্বান আমাকে অবশ করে দেয়। কোন অরণ্যে প্রবেশ করবো আমি? কোথায় নিধুবন। কুঞ্জকাননের রাধিকার দিকে চেয়ে থাকি আমি।
আমি? আমি কী করব? কোথায় যাবো?
কোথাও যেতে হবে না তোমায়। আমার সঙ্গে থাকবে। তখন পাল্টা প্রশ্ন আমার এখন কি তুমি যেতে পারবে আমার সঙ্গে আজ? চলো হারিয়ে যাই জনারণ্যে! আজ আমি মানবো না কোন পিছুটান।
দরীর কোন উত্তর নেই। একদা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে ছিলাম সত্যি, কিন্তু আজ পড়ে গেলাম মহাবিপদের মধ্যে। রাত আর দিনের পার্থক্য ভুলে গেলাম। মনস্থির করতে পারছি না কি করবো? কোথায় যাব? কাকা-বাবা, মা আর কাকীমার সখ্যতা সেদিন আমাকে বিরত রেখেছিলো। আজ তাদের অনেকেই ধরাধামে নেই। তারপরও আজ আমি আর আমাতে নেই। যখন একজন অপরজনকে ভালো বেসেছিলাম, মত্ত ছিলাম প্রেমে। তখন সমাজ, ধর্ম বা অন্য কিছুর বাছবিচার ছিলো না আমাদের। কিন্তু বাস্তবের কষাঘাত ভালোবাসার হৃদয় দুটোর মাঝে দেয়াল তৈরী করে দিলো।

ভালোবাসার প্রবল তোড় সে দেয়াল ভেঙ্গে দিলে হয়তো আজ গল্পটি অন্যরূপ লিখতে হতো। দ্বিতীয় যাত্রায় কিছুদিন একত্র চলার পর, আবারও ঘুর্নি এলো, বদলীজনিত কারণে দু'জন দু'দিকে ছিটকে পড়লাম। সরে যাবার আগেও একটি কাজ করলো বহু কষ্ট করে সেজুঁতিকে আমাদের জীবনের সাথে জুড়ে দিলো সময় বহতা নদীর মতো বয়ে চললো। আমাদের বিচ্ছিন্ন জীবন রূপ রস গন্ধহীন এগিয়ে চললো। বিভিন্ন কারণে আবেগের রঙ ফিকে হয়ে এলো। যৌবনে যখন আবেগ ছিলো খুবই প্রবল, কলেজের প্রথম দিকে, আমি ছায়াছবির নায়কের মতো আঙ্গুল কেটে একদিন তাজা রক্ত দিয়ে ওর সিঁথির সীমান্তে এঁকেছিলাম নিজের জন্যে মঙ্গালচিহ্ন। দরী আমার সেই কাটা আঙ্গুলে একটি সোনার আংটি পরিয়েছিলো পরম আবেগে। যেটি আমি এখনও ধারণ করে আছি। যদিও স্মৃতির আয়নায় এখন অনেক

ধুলো। হৃদয় তন্ত্রীতে আজ আর ঝংকার তোলে না কোন নিক্কন ধ্বনি। রিনিক ঝিনিক শব্দ ছাড়াই, জীবন বয়ে যাচ্ছে আজ স্রোতহীন বেগহীন।

পুর্ব জীবনে ফেলে আসা কোন সোনালী ক্ষণের কথা মাঝেমধ্যে আমাকে ভীষণ জ্বালায়। আমি ভুলে যাই বর্তমানের সুখ দুঃখ বেদনাকে। সময়ে অসময়ে আনমনা হই। সর্বকিছু ছাপিয়ে বিয়ে নামক দুই অক্ষরের একটি শব্দ আমার জন্যে খুবই গুরুত্বপুর্ণ হয়ে ওঠে। আমি ও দরী অনুভব করি বিয়ে নামক দুটি আত্মাকে একত্রে থাকার সমাজিক স্বীকৃতির কত প্রয়োজন। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিয়ে হচ্ছে দুজন নর-নারীর যথার্থ মেলবন্ধন। যা একটি সম্পর্কের সত্যিকার পরিচিতি দেয়। সেটা জৈবিক হোক অথবা সামাজিক। দু'জন নরনারীর মধ্যে যতই গভীর সম্পর্ক থাকুক সেটা আত্মীক হোক বা অন্য কোন প্রকার হোক, বিয়ে ছাড়া সমাজ স্বীকৃতি দেবে না। স্বীকৃতিবিহীন সম্পর্ক বজায় রাখতে হৃদয়-দরীর খুবই কষ্ট হচ্ছিলো। একসময় সম্পর্ক সুত্র হাল্কা হয়ে যায়। সেজুঁতি হৃদয়ের যৌথ জীবন সামাজিক স্বীকৃতি নিয়ে এগিয়ে চলে। একই ছাদের নিচে দু'জন পুর্ণ মানুষের প্রেমহীন জীবন এগিয়ে চলে। ডালপালা বিস্তার লাভ করে।

গতকাল প্রায় এক যুগ পরে হঠাৎ ওকে দেখে আমার হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠলো। পাপ কি অপাপ সে প্রশ্ন আমি মুহুর্তেই ভুলে গেলাম। কখন কাছে যাবো সেটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ালো। ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। ওর সাথে আমার সম্পর্ক সকল স্বকীয়া ও পরকীয়ার সজ্ঞা অতিক্রম করে তৈরি হয়েছে। হৃদয়ের হৃদয় কোন কিছুই আজ মানতে চায় না। এক নিমিষে আমি আমার বর্তমান অবস্থান ভুলে গেলাম, অহর্নিশ একই চিন্তা কখন ওকে খুঁজে বের করবো। যাপিত জীবনের সকল প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি ছাপিয়ে মন্দোদরীই এখন মুখ্য ব্যাকুল হৃদয় শুধু একজনকে খুঁজে ফিরছে। মধুময় স্মৃতির খন্ড খন্ড চিত্র আমাকে বর্তমান থেকে দুর অতীতে ফিরিয়ে নেয়।

ছোট বেলায় যখন গ্রামে থাকতাম তখন গ্রামের পরিবেশ ছিলো অসাম্প্রদায়িক, সকালে যেমন মসজিদ থেকে ফজরের আযান শোনা যেত, তেমনি টুংটাং ঘন্টা ধ্বনিও শোনা যেতো নিকটতম ধর্মশালা থেকে। লালপাড় শাড়ি সিঁদুরটিপ বেলী ফুলের মালা জড়ানো এলো খোঁপা-ভরসন্ধ্যে বেলায় তুলসী মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে একগলা ঘোমটা মাথায় শাঁখ বাজানো নারীদের যেমন দেখতাম-তেমনি দীঘি সমান পুকুরের এ পাড়ে মাগরেবের আযানের পুর্বক্ষণে নামাযের প্রস্তুতি নেওয়া নারীদের ও দেখতাম। এই দেখার মাঝে তখন কোন বৈরীতা খুঁজে পেতাম না। পুঁজো, পার্বন, ঈদ শবেবরাত সহ দুই ধর্মের গুরুত্বপুর্ণ অনুষ্ঠানগুলো সবার জন্যেই আনন্দ বয়ে আনতো।

শীতকাল এলেই ছোট ঠাকুর বাড়িতে কীর্তনের আসর বসত। কীর্তনের সুরের রেশ অনেক দিন বজায় থাকতো লোকালয়ে। রাত গভীর হলে পালা শুরু হতো। সারা রাত ধরে পালা চলতো। হিন্দু মুসলিম সাধারণ মানুষ পালার নট-নটীদের আওড়ানো সংলাপগুলো অনেক দিন উচ্চারণ করতো। শ্রীকৃষ্ণ আর রাধার প্রেম নিয়ে সরস আলোচনা হতো। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, রাধা, গোপীদের কাহিনী , কৃষ্ণের প্রণয়লীলা যেমন মুসলিমরা জানতো, তেমনি কারবালার বিয়োগান্ত কাহিনী-তাদের হিন্দু প্রতিবেশীরা জানতো। শবেবরাত রাতের হালুয়া রুটির ভাগ ওরাও পেত। লক্ষ্মী পুঁজোর মিষ্টি, প্রসাদ পায়নি এমন মুসলিম পরিবারের সংখ্যা খুবই কম ছিলো। ছোট ঠাকুর বাড়িতে আমাদের জন্যে পালা দেখার বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো। দরীর মা অর্থাৎ আমার বড় কাকীমার বিশেষ পক্ষপাত ছিলো আমার জন্যে। আমার মায়ের সাথে কাকীমার সখ্যতা ছিলো ঈর্ষণীয়। নিজের মা আর কাকীমার আদর স্নেহ সমভাবে উপভোগ করেছি আমরা। চার দশক আগের বাংলার যে গ্রামের কথা আমি বলছি, তা এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের বাড়ির সম্মুখের দিঘিসম পুকুরটির দু'পাশ জুড়ে ছিলো স্নিগ্ধ সবুজ মাঠ, উত্তর আর দক্ষিণ

পাশে নয়নাভিরাম গাছপালা, গাছপালার মাঝেই পুকুরে আসা যাওয়ার রাস্তা, দু'পাড়েই দু'বাড়ির শান বাঁধানো ঘাট। ভিন্‌ধর্মের অনুসারী হয়েও নির্দ্বিধায় পুকুরটি ব্যবহার করতো সবাই। পানি আর জল ওখানে একাকার ছিলো। গ্রাম বাংলার প্রধান খাদ্য ভাত-মাছ-ডালের মাঝে কোন প্রভেদ ছিলো না। আমার জীবনের দিনপঞ্জির শুরু ওখানে। রজত রেখা নদীর স্বচ্ছ পানি আর সোনারং গ্রামের সোনা ফলা ফসলের মাঠ ঘিরে আমাদের জীবন।

ছোট ঠাকুর বাড়ি আর বড় ঠাকুর বাড়ি কালের বিবর্তনে ও সময়ের দাবীতে বিপরীতমুখী ধর্মের অনুসারী হলেও কোথায় যেন একই গ্রন্থিতে বাঁধা ছিলো। সকাল বেলা দু' কিলোমিটার দূরের লঞ্চ স্টেশন থেকে লঞ্চ ধরে মহকুমা শহর মুন্সীগঞ্জে আসতাম কলেজে পড়াশোনার জন্যে হরগঙ্গা কলেজের সেই দিনগুলোর কথা এখনো মনে পড়ে। সকল কোলাহল আর হৈহুল্লোড়ের মাঝেও আমার মনটা পড়ে থাকতো রজত রেখা নদীর ধারে বেনী ঝুলানো একটি বালিকার কাছে। সে তখন গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সকলের অলক্ষ্যে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতো সারাদিনমান। একে অপরকে এক নজর দেখার জন্যে অধীর হয়ে থাকতাম আমরা। কোন দিন পকেটে পয়সা থাকলে শহর থেকে ওর জন্যে কোন না কোন সামগ্রী কিনে আনতাম আমি।

কৈশোর থেকেই হৃদয় চৌধুরী হৃদয় নামক বস্তুটা বাঁধা পড়েছিলো দরীর কাছে। কৈশোর পেরিয়ে দুরন্ত যৌবন-প্রথম যৌবনের নোনা স্বাদ-চোরা চাহনির মুগ্ধতা, ইশারা ইংগিত সেই মধুময় দিনগুলো আজ হারিয়ে গেছে। বড় কষ্ট হচ্ছে ভাবতে পারছি না আমি। সকাল পেরিয়ে দুপুর, বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে কি হলো আমার। জীবনের এ কোন কানা গলিতে দাঁড়িয়ে আছি আমি? যদিও জানি দরীর আর আমার সম্পর্কের আজ কোন সামাজিক ভিত্ নেই। তবুও এই সত্য কথাটি মন মানতে চাইছে না। দু'পরিবারের গভীর সম্পর্কের কারণে কৈশোরে একবার মন্দোদরীদের মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম আমি। ওর মামার বাড়ি তিতাস নদীর তীরে রঘুনাথপুর ও রাধানগর সীমান্তে দু'টি গ্রাম জুড়েই মামার বাড়ি। এ সময়ের মতো বাস বা সড়ক পথের যোগাযোগ ছিলো না। রেল ও লঞ্চই ছিলো একমাত্র ভরসা।

বিক্রমপুর থেকে ঢাকা হয়ে ব্রাহ্মনবাড়িয়া। রেল লঞ্চ দু'টোই মাধ্যম। মন্দোদরীরা তিন ভাই বোন, আমি কাকীমা আর দরীর মেজো মামা সুরেন্দ্র মুখার্জী, কাক ডাকা ভোরে রওয়ানা হয়েছি ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে। লঞ্চে দু'ঘন্টা তারপর ঢাকা কমলাপুর। ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ট্রেন ছাড়লো। রেলস্টেশন বহু লোকের ভীড় কুলি, হকারদের চিৎকার চেছাঁমেছি সে এক দারুণ বর্ণনাতীত অনুভূতি। আমরা ট্রেনের একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসলাম। ট্রেন ছাড়ল। সেই মাদকতাময় শিহরণ জাগানো শব্দ কুঝিক-ঝিক-কুঝিক-। তেঁজগাঁও স্টেশনে থেমেছে ট্রেন। আমাদের সামনে হঠাৎ এক চপমুড়িওয়ালা এসে দাঁড়াল। ঠোঙা রেডি করাই ছিল। ধরিয়ে দিল এক একজনের হাতে। সুরেন্দ্র মামা বললেন, নিয়ে নাও। আজো মনে আছে সে মুড়িচপের আথিতেয়তা। মুড়ি চপ খেতে খেতে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকি।

সজোরে পিছিয়ে যাচ্ছে সবুজ গ্রাম মাঠ, ঘাট, ক্ষেত, সরু নদী। এই অনাবিল প্রকৃতির মধ্যে কোথাও কোনও অকৃত্রিমতার গন্ধ নেই। এই একই দৃশ্য আমার পাশে বসে দরীও দেখছে দিনে দিনে জীবনের চিত্রপটও এমনি করে স্মৃতিপট হয়ে যাচ্ছে। এরপর আমি আর মন্দোদরী আরো একবার একত্রে ওদের মামার বাড়িতে গেছি। ওর মামারা রাধা নগরের এক সময়ের ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন। শান্তনা কাকীমার বাবার বাড়ির পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেও কোনও সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া দেখিনি। বেশ তৃপ্ত, সুখী পরিবার। প্রচুর জমিজামা, দুটো ইটখোলা। ওর এক মামাতো দাদা সুবীর চট্টগ্রামে ডাক্তারি পড়ত। এখন শুনেছি প্রেয়সী হয়ে আগরতলায় প্র্যাকটিস করছে। ওদের বাড়ির সমস্ত আসবাব থেকে শুরু

করে খাবার প্লেট অব্দি আভিজাত্যের ছাপ। চলন-বলন সর্বত্রই এরা অভিজাত। দরীর মামার বাড়িতে আমার খাতির যত্ন একটু বেশিই হয়েছে। এখানে এসে শুনলাম সত্যকাকুর সাথে আমার বাবা যৌবনে বেশ কয়েকবার এ বাড়িতে এসেছিলেন। দরীর ডাক্তারী পড়ুয়া দাদা বাম রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলো। রবীন আমার সমবয়সী দরীর অপর মামাতো ভাই খুবই চমৎকার ছেলে। কিশোর বয়সেই অন্য কিছুর তুলনায় সাহিত্যসেবার দিকেই ওর ঝোঁক ছিল বেশি। আলাপে জেনেছি ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরে থেকে স্কুলে পড়ে। তবে খুবই ঘরমুখো শহরে একটানা বেশিদিন থাকতে পারত না, রবীন হাঁপিয়ে উঠত। প্রায়ই নানা অযুহাতে আসতো গ্রামের বাড়ি। রবীন খুবই ভালো ছেলে ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে ওর যে একটা নিবিড় যোগাযোগ ছিল। সেটা টের পেয়েছিলাম ওর সাথে কথা বলে। মাত্র ক'ঘন্টায় কত গাছপালা, পাখি, ফুল চিনিয়েছিল সে আমাদের। এখনও দু'একটার নাম মনে আছে।

ঝাঁটি ধনচে, ওখানকার লোকে বলতো ডাকাতে পাতা। বনতুলসী, বনকর্পুর। রবীন পাতা ছিঁড়ে গন্ধ শুঁকিয়ে ছিল আমাদের। সৃষ্টিকলা পাখি চিনিয়ে ছিল। সেদিনের আর একটা ঘটনার কথা খুব মনে পড়ে, দুটো সাইকেলে চেপে আমরা প্রকৃতি চিনতে বেরিয়েছিলাম। আমি মন্দোদরীকে ক্যারি করছি, একাই সাইকেলে চেপে অগ্রসর হচ্ছে বরীন। সংবেদনশীল মনের চটপটে একটি কিশোর এই রবীন। আমার চেয়ে বছর খানেক ছোট। আমরা যখন বাড়ি থেকে বের হই তখন পড়ন্ত বেলা বিকেল তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। পাশাপাশি দুটো সাইকেলে মাইল চারেক পথ অতিক্রম করেছি। ঘুরা ফেরা শেষ করে ফিরে আসছি ওদের বাড়ি। ফেরার সময় ধরেছি অন্য মেঠো রাস্তা। বিকেল নিভে আসছে ক্রমশ। রবীন তখন আমাদের চেয়ে বেশ কিছুটা দূরে, হঠাৎ দেখি একটা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। সাইকেল স্ট্যান্ড করে গাছটার দিকে চেয়েই আছে। আমরা যখন ওর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, দেখি কাঁদছে। আমরা ওর কান্নার কোন কারণ বুঝতে পারছিলাম না। ব্যাথা ট্যাথা পেয়েছে কিনা ভেবে জিজ্ঞেস করলাম।

-এ কীরে, তুই হঠাৎ কাঁদছিস কেন? অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলাম আমি ও মন্দোদরী । আঙ্গুল তুলে গাছটাকে দেখায়। প্রথমটায় আমার চোখেও ভীষণ ধাক্কা লাগে, গাছটার কান্ডের সমস্ত ছাল বাকল কারা যেন তুলে নিয়েছে। কান্ডের কিছু সজীব অংশে তখনও ছুরির দাগ স্পষ্ট। কান্না ভেজা গলায় রবীন বলে যাচ্ছিল, এটা অর্জুন গাছ, নানারকম ওষধপত্তর নাকি হয়। তা বলে, বারবার গা থেকে ছালচামড়া তুলে নিয়ে যাবে! ওর লাগে না! কী নরম মনের ছেলে এই রবীন।

সাংঘাতিক নরম মনের ছেলে এই রবীন শুনেছি এখন পুর্ব বাংলা সর্বহারাদলের খুব বড় বিপ্লবী নেতা। স্বচ্ছল পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কখন কী ভাবে ওর মাথায় বিপ্লবের বীজ ঢুকে গেল কে জানে ! হয়তো চারদিকে শোষণ বঞ্চনা ওর নরম মনকে শক্ত হতে বাধ্য করেছে। যদিও বিপ্লব একটু বড় কথা হয়ে গেল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলাসর্বহারা দলের আঞ্চলিক প্রধান। রবীন ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। প্রশিক্ষণ শেষে সে এসেছিলো মেলাঘরে তখন ওর সাথে শেষ দেখা হয়েছিলো। দেশের জন্যে ওর ভালোবাসা ছিলো অত্যন্ত প্রবল। রবীন ছেলেটির সাথে দরীর খুব সখ্যতা ছিলো। কাকীমার বাপের বাড়ির প্রায় সবাইকে আমার কাছে খানিকটা অহঙ্কারী মনে হয়েছে, ভিন্ন ছিল রবীন। যদিও কাছাকাছি থেকেও রবীনকে ঠিক চিনতে পারিনি তখন।

মন্দোদরীও নিশ্চয়ই খোঁজ পায় নি রবীনের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিপ্লবী রবিনের অস্তিত্ব। জনগণের মুক্তির জন্যে যে রাস্তা রবীন বেছে নিয়েছে, তা তো আত্মহত্যার সামিল। আজ এ মুহূর্তে সমাজে সশস্ত্র বিপ্লবের কোনও পরিবেশই নেই। গত তিরিশ বছরে প্রতিক্রীয়াশীল কর্মকান্ডে আকাশ অন্ধকার মেঘ ঘিরে

আছে। এখন বাতাসে বিপ্লবের কোন আভাস নেই। কয়েকদিন আগে ক্রস ফায়ারে মারা গেছে রবীন। আমার খুবই খারাপ লাগছে। আমি আবার ফিরে আসি অতীত সুখময় স্মৃতীতে।

বাড়ির সন্নিকটে আমরা। চাঁদ আর মেঘের লুকোচুরি চলছে সারাক্ষণ। তার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারা যে আলো তাতেই পথ চলা। কাছে কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। শুধু দুরের আবছা চলমান জীবনের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। আলো আধারের মাঝে আমরা যখন বাড়িতে ফিরি তখন রাত আটায়। আজ সে সময় কথা ভেবে আমি আবারও তন্ময় হই। সবচাইতে দুর্লভ বস্তুটি হারাবার স্মৃতি রোমন্থন করে বোবা কান্নায় মথিত হয়ে উঠলো আমার সমস্ত সত্ত্বা। ভাষাহীন সজল চোখে তাকিয়ে রইলাম সকল বেদনার আশ্রয়স্থল নীল আকাশের দিকে। সেখানে অসীম শূণ্যতার বুকে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে বেদনা বিধুর এক জোড়া পায়রা। উজ্জ্বল আকাশ আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে আর ওদের পিছনে পিছনে এক শিকারী বাজ। সময় আর সমাজ নামক বাজ পাখিটি কি কখনও অনুধাবন করতে পারবে আমার আর দরীর হৃদয়াবেগ?

সামাজিক বিধি-নিষেধ, আর ধর্মের বিধান দু'টি প্রেমিক হৃদয়ের মাঝে পাহাড় সম দাঁড়িয়ে রইলো অনন্ত কালের জন্যে। একত্রে থাকলাম, খেলাধুলো করলাম, সময় কাটালাম, হৃদয় বিনিময় করলাম, আরো অনেককিছু স্বাভাবিক ভাবেই হলো সব কিছু বাঁধা হলো না কোন কিছু। শুধুই ঘর বাঁধায় প্রবল আপত্তি। মা একদিন কথা প্রসংগে বলেছিলেন, হৃদয়ের জন্যে দরীর মতো একটি বউ হলে খুব ভালো হতো! কিন্তু দরীকে বউ হিসেবে মানতে তার প্রবল আপত্তি। দু'টি পরিবারে ব্যক্তি হৃদয় ও দরী গ্রহণযোগ্য হলেও যুগলে ওদের গ্রহণ করতে কোন পরিবারই রাজী নয়। শান্তনা কাকীমা হৃদয়কে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। আমার মা দরীকে কন্যাসম। দু'জনের সম্পর্ক কারো কাছে অজানা নয়। বাঁধাগ্রস্ত হয়নি এর বিস্তার। কিন্তু যখন আমরা বিয়ে করব এমন একটা গুঞ্জন শোনা গেল, তখনি বিপত্তি। দু'পরিবার হঠাৎ করে সচেতন হয়ে ওঠলো। শুরু হলো সকল প্রকার বৈরীতা। সকল দুর্বলস্থানে আঘাত করা হলো।

হিসেব করে দেখলাম বার বছর আগে দরীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি আমি। মান অভিমান আর ষড়যন্ত্রের কারণে বিগত বারটি বছর আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছে। আজ সকাল বেলা ওকে দেখার পর আমার পৃথিবী হঠাৎই সুন্দর হয়ে উঠলো। জীবনের সকল আলো একত্রিত হলো। রঞ্জীন উজ্জ্বল আলোতে আমার দ'ুচোখ ভরে উঠলো। গাড়ির সীটে কাকে দেখলাম আমি। দীর্ঘ এক যুগ পরে আবারো মনে হলো অফিস ক্যাম্পাসে বসে আছি। হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখি দরী দাঁড়িয়ে আছে সেই চাঁপা গাছের নিচে। মন খারাপ হয়তোবা, কাছে যেতেই কেঁদে ফেললো। আমি আগাগোড়া কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে মনে মনে সন্দেহ হল একটু। কারণ এই মেয়েটিকে আবাল্য ভালোবাসি আমি। মনপ্রাণ উজাড় করা ভালোবাসা। সেই স্বপ্নের রাণী কেঁদে আকুল হচ্ছে কিন্তু কেন? কি রে কাঁদছিস কেন? উত্তরে শুধু বললো আমি আর বাঁচবো না হৃদয়। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচবো না। আমি তাকে অভয় দিলাম, অনেক সম্ভাবনার কথা শুনালাম। সংকল্প বাস্তবায়নের জন্যে আমার দৃঢ় মনোবলের কথাও জানিয়ে দিলাম। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই করলাম কী?

ইচ্ছে করলে আমি কী পারতাম ঘর সংসারকে অস্বীকার করতে? কাকীমার স্নেহের দরী, বাবার স্বাস্থ্য সমস্যা এসব কি খোঁড়া যুক্তি নয়? 'এখন যৌবন যার যুদ্ধের যাবার সময় তার' একথাটি আমার জন্যে অপ্রযোজ্য হয়ে রইলো। এদিকে ওর বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। শুনেছি বর বিদেশে থাকে। শহরে বাড়ি আছে। একই ধর্মমতের প্রতিষ্ঠিত ছেলে। মেয়ের এতো বড়লোক ছেলের সাথে বিয়ে হবে ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি, তাই ভীষণ খুশি দরীর বাবা-মা। ওর মামারা এ বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। আমার প্রতি গভীর স্নেহ

থাকলেও মেয়ের বর হিসেবে ধর্মের প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় তাই কাকীমাও নিশ্চুপ ভালোয় ভালোয় মেয়ে বিদায় হলে তিনি বাঁচেন। সংসার বিমুখ সত্য কাকার শুধুই দীর্ঘশ্বাস!। শেষ মুহূর্তে ফিরে ফিরে এসেছিলো দরী। আমি ওকে অনেক বলে-কয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার অপারগতা কেন, তা বলিনি বলা যায় নি। দরী ঘর সংসার ধর্ম ত্যাগ করতে সাহসী হয়ে ছিলো। কাকীমার স্নেহের দাবীর কাছে নিজেকে সমর্পন করে ছিলাম আমি আজ মনে হয় ওটা ছিলো পলায়ন। এই আত্মসর্মপনে আনন্দ বা সুখ ছিলো না, ছিল ব্যর্থতার দায়ভার। দরীর ভালোবাসার প্রতি নিষ্ঠুর আচারণ করেছিলাম আমি। সেদিন কেন শুধু অযুহাত দাড় করাতে ব্যস্ত ছিলাম আমি। আমার শরীরে সেদিন ছিলো শুধই কনকনে শীতের প্রভাব। সাহসের উষ্ণতা ছিলো না। আপ্রান চেষ্টা করেছে মন্দোদরী।

নারী হিসেবে সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থায় থেকেও জানবাজী যুদ্ধ করেছে সে। প্রথমবার ফিরিয়ে দেয়ার দিন কয়েক বছর পর আবারও এসেছিলো আমার কাছে। বলেছিলো ধর্মান্তরীত হতে ওর এতটুকু আপত্তি নেই। একথাটা ধর্ম ত্যাগ করেই প্রমান করতে চায়। আমি বললাম ধর্ম নয় আমার কমজোরি অন্য জায়গায়। দরী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলো। তারপর কান্নার মাঝেই স্থান ত্যাগ করলো। আমার সংস্কার, কাকীমার স্নেহের দাবীর অযুহাত, সর্বোপরি ভীরুতার জন্যে দরী পর হয়ে গেলো। তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, অনেক প্রহর হয়েছে অতিক্রান্ত।

আজ প্রতি মুহূর্তে মনে হয় দরী আমার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় মনোবল সম্পন্না ছিলো। ওর চাওয়া পাওয়াতেও কোন খাঁদ ছিলো না। শৈশবকালের প্রতিকূল অবস্থায় বড় হয়ে সে মানসিক ভাবে অনেক দৃঢ় ছিলো। ছোট বেলা থেকেই সে দেখে এসেছে বাবাকে সময় অসময়ে নেশা করে মাকে মারধর করতে। ওর চোখের সামনে মাকে অনেক নির্যাতন করেছে।। শুধু তাই নয় ভাই বোনদের ওপরও বাবার এই নির্যাতনের মাত্রা কোন অংশে কম ছিল না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ নারীর বৈষম্য সম্বন্ধে ওর জ্ঞানের কমতি ছিলো না। বাবার উপার্জনের উৎস ছিল গ্রাম্য ডাক্তারী। রোজগারের সিংহভাগ টাকাই বাবা নেশা ও জুয়ায় শেষ করতো। চাহিদা ও আয়ের মাঝে সংগতি না থাকার কারণে সংসারে সকলের বাবার প্রতি প্রকট বিদ্বেষভাব ছিলো। মাঝে মধ্যে বাবা বাড়ি ফিরতেন না। সপ্তাহে দুই/একদিন ছাড়া বাকি দিনগুলো তার কাটতো মাদক পল্লীতে অথবা অজানা কোথাও। বাবার আদর স্নেহ তেমন পায়নি ওরা। খেয়ে না খেয়ে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ঘিরেই বেড়ে উঠেছে ওরা।

বাবার পূর্ব পুরুষের জমিদারী না থাকেলও জমিদারী মেজাজটি অক্ষুন্ন ছিলো। কারণে অকারণে তিনি ফুঁসে উঠতেন। মা, বাবার চারিত্রক বৈশিষ্ট্য ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। মন্দোদরীদের সম্পূর্ণ জীবনটাই ছিলো প্রতিকূলতায় ভরা সর্বত্র বাঁধা আর বঞ্চনা। জমিদার পরিবারে জন্ম এটাই ওরা জানতে। জমিদারীর শুক্ল পক্ষ ওরা দেখেনি, কৃষ্ণ পক্ষ দেখতে দেখতে মন্দোদরী বড় হয়ে উঠেছে। বন্ধু শুধুই আমি। মন্দোদরীর স্কুল শিক্ষিকা মা, ওরা দু'বোন আর ওরভাই নন্দদুলালের ভরণ পোষণ, শিক্ষার ব্যয় জোগাড় করতে করতে ক্লান্ত। আমাদের লাগোয়া ওদের বাড়ি হওয়ার কারণে, আমার বাবা আর মন্দোদরীর বাবা ছোট বেলার বন্ধু হওয়ার সুবাদে কাকীমা আমাকে ছেলের মতই আদর করতেন। অভাব অন্টনের সময় আমার মা সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে আসতেন তার সখীসম প্রতিবেশির জন্যে। আমার মা আর কাকীমার সম্পর্ক এতই অন্তরঙ্গ ছিলো যা অনেকের জন্যে ঈর্ষণীয় ছিলো।

লেখা পড়া শিখে আমার বাবা সরকারী চাকুরে, সত্য ভূষণ কাকা গ্রাম্য ডাক্তার হয়েছেন। তাই বলে তাদের বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি। জীবনের সকল মোড়ে, সকল ঝড়-ঝঞ্ঝায় দু'টো পরিবার কাছাকাছি ছিলো। ওদের

স্নেহের ঋণ আর পারিবারিক সৌহার্দ্যের ভিত্ খুবই মজবুত ছিলো, আর ওখানেই আঘাত দিতে আমার অপারগতা। যদি দরীকে নিয়ে দেশান্তরী হই, তা হলে দু'টো পরিবারের যুগ যুগের সৌহার্দ্যকে অপমান করা হবে। পালিয়ে যাবো কি, যাবো না এই দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসাকেই জলাঞ্জলী দিলাম। জীবনের সর্বশ্রেষ্ট অর্জনটিকে ত্যাগ করে বলা যায় শূণ্য হয়ে গেলাম। নিঃসঙ্গ আমি। কাঞ্চনমূল্যে কেনা ভালোবাসা হারিয়ে বোধশূন্য বিবশ ব্যক্তিত্বে পরিণত হলাম আমি।

নিশ্চুপ রাত। সময়ের ঘন্টাটা বারো পেরিয়ে গেছে খানিক আগে। নাগরিক কোলাহল মুক্ত এই নগরীকে এখন বেশ শান্ত লাগছে। দুষ্টু ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে যেমন শান্ত-সুবোধ লাগে ঠিক তেমনি। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে আকাশ্রয়ী আবার আমি। আজ আকাশ জুড়ে জোছনার আলোকচ্ছটা। ভরা পূর্ণিমা বোধ হয় আজ। একটা সিগারেট জ্বালাই। একবার দরজা দিয়ে ভিতরে দেখি। আমার স্ত্রী সেঁজুতি পাঁচ বছর বয়সী আমার আদরের কন্যা চন্দ্রাকে নিয়ে বেশ আরাম করে ঘুমোচ্ছে। কত নিশ্চিত ওরা। দৃশ্যটা বড় ভাল লাগে। তবুও মন আবারো অতীতে ফিরে যেতে চায়। এ কোন মানবিক দুর্বলতা, আমি বুঝতে পারি না। আমি আবার জোছনা দর্শনে মত্ত হই। জোছনার আলোয় সিগারেটের ধোঁয়া রহস্যময়তার সৃষ্টি করে। জোছনার মুগ্ধকর আলোতে জীবনের আঁধার দুর করতে চাই আমি।

এমন আবহ পেছনে ধুলিস্তরে ঢেকে থাকা স্মৃতির দেশে উড়িয়ে নেয় আমাকে। হৃদয়ের দুয়ার খুলে আমি দেখতে থাকি তিন যুগ আগের আমাকে। আমার আবেগ, আমার অনুভব আমার ভালোবাসা এই সুনশান রাতে কথা বলতে শুরু করে। ফেলে আসা ভালোবাসার অনুভবের মাঝে আমি উপলব্ধি করি, এমন একদিন ছিলো যখন দরী ছাড়া আমার পৃথিবী ছিলো সম্পূর্ণ অন্ধকার। পৃথিবীর রূপরস গন্ধস্পর্শ সব কিছুই ছিলো মন্দাদরীকে ঘিরে। দু'জনের মাঝে গড়ে ওঠা সম্পর্কটাকে হয়তো ভালোবাসাই বলে। জীবনের সবগুলো মোড়ে আমি নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অদৃশ্য কোন শক্তি আমাকে গন্তব্যে পৌঁছাতে দেয়নি। তীব্র বাঁকে নিয়ন্ত্রণ আর ধরে রাখতে পারিনি। আনাড়ি যান চালকের মতো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বাঁকা পথের কান গলিতে পথ হারিয়েছি। আমার ভাই বোনেরা কেউ আমার মতো নয়। ছোট ভাই আরমান চাকরি পাবার দেড় বছরের মধ্যেই বিয়ে করে ফেললো। বাবা মার আপত্তি গ্রাহ্যই করলো না। আমার স্বভাবটা ছোট বেলা থেকেই অন্য রকম। দ্বিধা, সঙ্কোচ আর মুখ ফুটে কিছু না বলতে পারার অভ্যেস। এই স্বভাব মাঝে-মধ্যে আমাকে বিড়ম্বিত করে। কষ্ট দেয়। কার কাছ থেকে কোন সুত্র থেকে এই স্বভাব আমি পেয়েছি আমার জানা নেই। শত চেষ্টার পরও আমার আলোকোজ্জল পৃথিবীর জমিনে অন্ধকার বিবর সৃষ্টি হয়েছে। সে বিবর থেকে বেরুতে পারিনি আমি।

মানসপটে ভেসে ওঠে কৈশোর পেরুণো আর যৌবন শুরুর সেই সব সোনালী দিনগুলো। চোখ বুজে দেখতে পাই হারিয়ে ফেলা কত সুন্দর মুহূর্ত । কান পেতে শুনতে পাই বকুলতলায় ওদের ঘরের পাশে আমাদের আড্ডার কথকতা। আমি নষ্টালজিয়ায় ডুবে যাই। কাকীমার তৈরী ঝালমুড়ির অমৃত স্বাদ আজো আমি উপলব্ধি করতে পারি। যদিও ঝালমুড়ির অমৃত স্বাদ গ্রহণ করার সামর্থ আজ আর নেই। জিহ্বা নামক অঙ্গটি বিগত অর্ধশতাব্দিতে অনেক কিছু চেখে দেখেছে নরম গরম অনেক কিছুই কিন্তু ছোট ঠাকুর বাড়ির ঝালমুড়ির স্বাদের তুলনা নেই। প্রথমে মাকে পরে প্রেয়সীকে চূড়ান্ত রূপে বধূকে ভালোবাসার অভিজ্ঞতা ধারন করেছি আমি। কিন্তু ঘুরেফিরে মন্দোদরী। ছোট ঠাকুর বাড়ির আড্ডায় মাঝে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে দরীকে খুঁজে পাওয়া যেতো না ও তখন বাড়িতে তৈরী কোন খাবার লুকিয়ে নিয়ে আসতো আমার জন্যে। সে সময় গুটিকয়েক মানুষের মজসলিশে রসাত্মক কথায় হাসাতে জুড়ি ছিলো না হোজ্জা খেতাবপ্রাপ্ত নন্দদুলালের। প্রায়ই দরীকে বলতে শোনা যেত, হোজ্জা সাহেব একটু থামবেন, না মারব এক ঝাটকা। হাসাতে হাসাতে পেটে খিল ধরিয়ে ফেলতো নন্দদুলাল। দরীর ছোট বোন শিখা তার মোহনীয় কণ্ঠে মাঝে

মাঝে শুনিয়ে দিতো কিছু শ্রুতিমধুর মনোমুগ্ধকর গান। পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলো আগ্রহ নিয়ে দেখাতো আমার ছোট বোন। দেখে খুশি হতাম আমরা সবাই। দু' বাড়ির এই আসরটি ছিলো কাকীমাকে কেন্দ্র করে সংসারের শত অনটনের মাঝেও কাকীমা আমাদের জন্য একটা না একটা খাবারের ব্যবস্থা করতেন। এই সময় কোন এক সুবর্ণক্ষণে নিজের অজান্তেই হৃদয়ের ভাষা চোখের মাঝে পড়তে শুরু করলাম আমি আর মন্দোদরী। ভাবার সময় হলোনা ও ব্রাক্ষণ কন্যা আর আমি মুসলিম কুলোদ্ভুত। আমরা তখন বসন্তের আশীর্বাদ প্রাপ্ত। তখন চারদিকে কৌমুদী আলোর বন্যা।

আজ আমার মনে হচ্ছে প্রেম বিষয়ক অভিধানে ধর্মের কোন অর্থ নেই। ধর্ম নামক মানব সৃষ্ট একটি ভিন্নতা ছাড়া সব কিছুই এক। ওর আমার রক্তের রঙ একই, বিশ্বচরাচরের অন্যসব নারীর মতো দরীও একইভাবে অনুভূতি ব্যাক্ত করে, প্রকাশ করে নিজেকে। প্রেমে সাড়া দেয়। আমার কাছে একজন সম্পূর্ণ মানবীর প্রতিকৃতি দরী। গায়িকা, নায়িকা, প্রেমিকা সব কিছুই। ওর কান্নার সুর আর হাসির রেশ সব কিছুই আমাকে স্পর্শ করতো। ওর সব ভালো গুনগুলো আমার বিবেচনায় আসতো। আমার চোখে বা দৃষ্টিতে দরীর চরিত্রের কোন দুর্বল দিক কখনো প্রতিভাত হয়নি। অবশ্য সকল মানবিক দুর্বলতার উর্ধে এক নারী মন্দোদরী। ওর আনন্দে আমি আনন্দিত হতাম, ওর সামন্যতম দুঃখ আমাকে ব্যাকুল করতো।

ওর বোন শিখার মতো অতো ভালো না হলেও দরী একজন ভালো গায়িকা ছিল। গোপনে আমার অনুরোধে ওকে মাঝে মধ্যে গাইতে হতো। কথাছিলো সারাটা জীবন ও আমাকে গান শুনাবে। ওর গানের মাঝেই ঘুমিয়ে পড়বো, ঘুম থেকে জেগে উঠবো ওর গান শুনেই। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আমি শুনতে পাই না সেই মোহময় কণ্ঠটি, যে কণ্ঠ শুনে সর্বকালে সকল প্রেমিক শক্তির দিশা পেয়েছে। বিগত দিনে গীত গানের সুরের রেশ বা অনুরণন ছাড়া আজ আর আমার জন্যে কিছুই অবশিষ্ট নেই। মন্দোদরী প্রসঙ্গ এলেই আমার স্মৃতির আধারটি নড়ে চড়ে ওঠে। রজত রেখা নদীর ধারে সোনারং গ্রামে ফিরে যাই আমি।

হঠাৎ চন্দ্রার কান্নার শব্দ শোনা যায়। তাকিয়ে দেখি সেঁজুতি চন্দ্রাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে শরীরে হাত বুলাচ্ছে। মায়ের স্পর্শ আদরে চন্দ্রা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আমি আবারও জোছনা বিলাসী হই। রূপচাঁদে তাকিয়ে ভাবি, পৃথিবীর বিশাল প্রান্তরের অতি অল্প স্থান জুড়ে প্রেয়সীর সাথে কাটানো নিরবচ্ছিন্ন মুহূর্তগুলোর কথা। মানব জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে কত খেলা। দু'জন নর ও নারীর প্রেমকে সমাজ কখনও সজ্ঞায়িত করে স্বকীয়া কখনো পরকীয়া বলে। অন্তরের টানে আজ দরীর কাছে গেলে লোকে নিশ্চয় পরকীয়া বলবে। ওর স্বামী হিরকনাথের অধিকারে হস্তক্ষেপ, অথবা চর্চা অনধিকার চর্চা হবে। কিন্তু আমার অবুঝ মন যে অধিকার অনধিকার বোঝে না। কৌমুদ আলোকে বুনো রাতের শুভ্র বসনা রজনী গন্ধার সেই ঘ্রাণ-যাতে আমি চিরকালের জন্যে উন্মাতাল ভুলি কেমনে?

দরী আজ দীর্ঘ একযুগ পরে কোথা থেকে এলো এই শহরে। আমাদের একত্রিত মধুর ক্ষণগুলোতো সময়ের প্রবল স্রোতে আজ ভেসে গেছে অন্য দিকে। কেন ওকে দেখলাম, ও কেন এলো। দরী কি আগের মতই আছে? ওকি আজ ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখি? ওদের সাথে কি আমাকে নিয়ে কোন কথা হয়, অথবা কোন বিশেষ মুহূর্তেও একজন ভীরু যুবকের কথা মনে হলেই ও আনমনা হয়? স্বপ্ন তো পুরণ হয়নি ওর। হীরকের একটা বাচ্চা ছিলো শর্মিষ্ঠা। আছেও বোধ বেঁচে হয় দ্বিতীয়টির জন্ম হয়েছে কি? খুব জানতে ইচ্ছে করে আমার প্রেয়সীর বর্তমান অবস্থা। কখনোই কি আর দেখা হবে না? রাত্রির আঁধারে আমার কানে ভেসে আসে সুমনের গান। 'অমরত্বের প্রত্যাশা নেই / নেই কোনও দাবি দাওয়া / নশ্বর এই জীবনের চাওয়া শুধুই বন্ধুতা।' আমি ফিরে পাবো কি দরীর বন্ধুত্ব অথবা তার চেয়ে বেশি কিছু? সেদিন যা সম্ভব ছিলো তা কি আজ এত সহজ। সেজুঁতির সাথে প্রতি রমণে দরীর চেহারা মনে পড়ে আমার। প্রতিটি

জৈবিক আনন্দে - ওকে কল্পনা করে উত্তেজিত, শিহরিত হই আমি। ওর কায়িক উপস্থিতির কথা আমি ভুলে যাই বিবশ মুহূর্তে। যখন সেজুঁতিতে নিজেকে সমর্পণ করে তখন আমি মন্দোদরীকে অনুভব করি।

রাতের প্রকৃতিতে এখন বর্ষার আমেজ। শরত এখন যৌবনবতী বর্ষার মতো। চারদিকে পানি। পানিতে টইটুম্বুর পৃথিবী এখন পোয়াতি নারীর মতো। ভাদ্রের ঘনঘোর, মেঘলা আকাশ, কখনো টাপুর টুপুর বৃষ্টি আর তারই মাঝে চলছে বন্যার প্রচন্ড দাপট। ওপর নিচ সব দিক থেকেই রাশি রাশি পানি ছুটে আসছে। মাত্র দু'দিন আগের পীচ ঢালা নগরের কালো রাস্তা এখন রূপালী নদীতে পরিণত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই বিপর্যস্ত পার্শ্ববর্তী পাড়ায়ও যেতে পারছি না আমরা। সত্যিকার অর্থেই পানি বন্দী হয়ে পড়েছি। বৃষ্টির প্রচন্ড বর্ষণ ঘরের বাইরে যেতে দিচ্ছে না। গতকাল সারাটা দিন আকাশের ফুটো দিয়ে অবিরাম ধারায় পানি ঝরেছে। রাতে অসময়ের শীতের কামড় ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলো আমার, চোখ খুলতে যদিও চাচ্ছিলাম না তবুও খুলতে হলো। শয্যার নিচে সযত্নে রাখা কাঁথাটি টেনে নেওয়ার পরিবর্তে, দ্বিতল ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বের দরজাটা খুলে বন্যা দেখতে লাগলাম। মাথার উপর মেঘ, থই থই আকাশে বৃষ্টির মাঝে মাটির সোঁদা গন্ধ।

ঘন সবুজ গাঁয়ে আটকে থাকা সজল মেঘ যেন গ্রাম্য কিশোরীর ভীরু চোখের মতো টলটলে। এই বুঝি ঝরে পড়বে একরাশ অভিমান নিয়ে। ফুসে ওঠা নীল পানির মাঝে নিজের ফেলে আসা জীবনের নিকষ কালো ছায়া দেখতে পেলাম। যদিও তখন চারপাশে ঘন অন্ধকার। দুস্ট মেঘদল পাহাড়ের মত ক্রমশ জমাট বাঁধছে। ভরা জোছনার রূপচাঁদের আলোকচ্ছটা ঢেকে আকাশকে মেঘরাজ্য বানানোর সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে দুস্ট মেঘের দল। আজ যেন তারকারাজির ছুটি। আজ আর জ্বলবে না প্রতিজ্ঞা করছে ধ্রুবতারাও। মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠা সাদা বিদ্যুতের সাথে উৎপন্ন শব্দেরা যুদ্ধে ছোঁড়া বোমার মত ফুটতে থাকে। মেঘেদের এখন সময় হয়েছে রেফারী বিহীন আকাশে খেলে বেড়াবার।

মনে পড়ে গেলো '৮৮র মহাপ্লাবনের কথা। আমি উত্তর জনপদে কর্মরত দরী বিভিন্ন কর্মস্থল ঘুরে বগুড়ায় এসেছে। তখন ভরা ভাদ্র। চোর পুলিশ খেলার মতো লোক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে আমি এসেছি ওর ভাড়া করা বাসায়, বাড়িটি দ্বিতল। দ্বিতল বাড়ির একটি কক্ষে সেদিন বৃষ্টি স্নাত অসময়ের শীত তাড়িয়ে ছিলো মন্দাদরীর উষ্ণ আপ্যায়ন। বাইরের প্লাবনকে টের পেয়ে ছিলাম নরম শয্যায় সিক্ত শরীরে। আজ ফেলে আশা জীবনের পানে তাকিয়ে মনে হলো, জীবন মানেই পথচলা। এই পথ চলার মধ্যে দিয়েই আমরা পেরিয়ে যাই সময়ের একেকটি বিভাজন রেখা। চারপাশের নানা ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে জীবন এগিয়ে চলে। এর মাঝে অপসৃত সময় রেখে যায় সাফল্য-ব্যর্থতার নিকাশ। যা আমাদের এগিয়ে নেয় ভবিষ্যতের পথে। তাই বোধ হয় সময়কে বলা হয় চালিকাশক্তি। বোধকরি ভালোবাসার মুহূর্তগুলোতে সময়কে টের পায় না মানুষ, যেমন আমরা পাইনি। ভালোবাসার অপ্রাপ্তিতে আগুণে পুড়ে যখন অঙ্গার হয় তারা তখনই টের পায় সময়কে। সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় কোন প্রকারেই শেষ হতে চায় না।

চারদিকে বন্যার থৈ থৈ পানির মধ্যে গত রাত আমার কেটেছিলো দরীর আবাসে। সারাটি রাতে শুধু আমি আর দরী। একটু দেরীতে ঘুম ভাঙ্গালো। জেগে দেখি শয্যায় আলু থালু পড়েছে এক নগ্নিকা দেবী ভেনিস। সবুজ, সাদা ও ফিকে হরিতের মিশ্রিত ব্যাকগ্রাউন্ডে দুটি সাদাশপটা বালিশ। তার পাশে শুভে মাথায় হাত দিয়ে গোলাপি দেহবর্ণের এক নারী। তার শরীরের এখানে-ওখানে নীল বর্ণের ব্যাপ্ত বিচ্ছুরণ। নগ্নিকাটির আনন্দঘেরা মুখচ্ছবিটি আমাকে আকৃষ্ট করে। কাছে গিয়ে গোলাপি অধরে অধর মেশাই। নড়ে ওঠে নগ্নিকা। এ নারীকে আমার চেয়ে মনোযোগ দিয়ে অন্য কেউ কখনো অবলোকন করেনি এবং আমার

জীবনটি নিয়ে এ নারী ছাড়া অন্য কেউ এতটা সাবধনতার সঙ্গে পর্যক্ষেণ করেনি। আমি স্বয়ং জীবনের ব্যাপারে সকল সময় উদাসীন। একটু আগে অবলোকন করেছি আমি দরী ভেনিসকে। গত রাতের খাট কি থেকে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে গোলাপি শিফনের স্বল্প বস্ত্রাভরণে ফুল্ল একটি নারী। মেয়েটি মূর্তি কি না তা যাচাই করার জন্য আমি তার দিকে গাঢ় চোখে তাকাতেই যে ফিক করে হাসে। আমি ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে বলি, যাক তুমি তাহলে বাস্তব। ক্ষণিকের জন্য আমি ফিরে যাই অন্য পরিপ্রেক্ষিতে।

আলিঙ্গানাবদ্ধ যুগল, নিস্তরঙ্গা বাদক এবং নৃত্যরত নারী-পুরুষের সমবেত উল্লাস মিলে-মিশে তৈরি করেছে এক বর্ণাঢ্য সরোবর। যেখানে সচেতনতা ক্রমশ ডুবে গিয়ে ভেসে উঠছে অবচেতনের হরিত ও সবুজে মেশানো কিশ্তি। সে কিশতির দু'জন যাত্রী। হৃদয় আর মন্দোদরী। আমি আচ্ছন্ন হয়ে ঘটনার প্রেক্ষাপট দেখি। সর্ষেফুলের পাপড়ি, ঘাস, লেবুপাতা ও জলপাইয়ের নরম ত্বকের কথা স্মরণ হয়। মনে হয় হলুদ ফিকে লেবু রঙের নিসর্গে শুয়ে, বসে ও নৃত্যমান এক নারী। তার শরীর এমনই গাঢ় হয়ে প্রকৃতিতে মিশে আছে যে, এতে বস্ত্রাভরণের কোনো প্রয়োজন নেই। ওর জড়ানে অঙ্গে একই সঙ্গে রিলাক্সেশন ও সেলিব্রেশন মূর্ত হয়ে উঠেছে। পৃথিবী ভুলে আমি দরীতে প্রবৃত্ত হই।

ইশ্বর প্রতিনিয়ত যে স্বপ্নাচ্ছন্ন সুন্দরের সৃষ্টি করে থাকেন, তার প্রতিই বোধ করি আমার স্পষ্ট পক্ষপাত। আমি যেন তার বিলাসে এক বর্ণাঢ্য গোধুলির তালাশ পাই, তারপরও আমার সাদ মেটে না।

তুর্কী হেরেমের বিবস্ত্র বালিকাদের কথা আমার মনে পড়ে এই নগ্নিকারপূর্ণ অবয়বে প্রেমের বেজায় রকমের বিমূর্ততা। সে খাট থেকে উঠেই করিডোরের অন্যদিকে হাঁটে। আমি ঘাড় বাঁকিয়ে তার চলে যাওয়ার দিকে তাকাই। গোলাপি বস্ত্রাভরণ ভেদ করে তার কটিদেশে ফুটে উঠেছে। আমার মানস পটে, তখন গোলাপি নারীদেহের মসৃণ উন্নয়নে এবার জ্বলে উঠে বিষাদগ্রস্ত নীল আগুন। কখন যে আমি ছুটে এসে করিডোরের অপর প্রান্তে আমি নিজেও টের পাই না। মেয়েটি ওহ্ নো বলে আমার শরীরের সঙ্গে এক হয়। তার কাঁধের ঝাঁকিতে প্রায় অনাচ্ছাদিত স্তন যুগল ও গ্রীবায় জলছোঁয়া গাংচিলের ডানার ইমেজ মূর্ত হয়। সে কাছাকাছি এসে আমার সত্তায় বিলীন হতে চায়। আর আমি চীনেমাটির বনেদি বাসন-কোসনের দোকানে ষাঁড়ের সৃষ্টি করি।

মন্দোদরীর সাথে দেখা হওয়ার প্রথমক্ষণটি এখন আমার মনে নেই। এটা ঠিক, জীবন বিনিময়ের সেই সোনালী দিনগুলিতে ঘুণাক্ষরেই ভাবিনি ওর জন্যে সারাটা জীবন আমাকে অদৃশ্য আগুনে পুড়তে হবে। এক সময় নির্দয় অগ্নির দহন থেকে বাঁচার জন্যে অন্য কিছুতে আশ্রয় নিতে হবে। বাল্য, কৈশোর, যৌবন কাটিয়ে, পড়ন্ত যৌবনে জীবনের রঙিন আর বিবর্ণ মুহূর্তগুলোর হিসেব করেছি আমি। আর্শিতে স্পষ্ট দেখতে পাই, সকল সময় আমার মনের মধ্যে এক ধরনের জেদ কাজ করে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আমি ভুল করি। যাকে আমি এত ভালোবাসলাম, আজ কিনা সেই আমাকে বলে তুমি সত্যিকার অর্থেই স্বার্থপর ভীরু! যদিও উক্তিটি মিথ্যে নয় তারপরও রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে, আমি নিশ্চুপ হয়ে যাই। আমি মনে মনে ভাবি ভীরু কথাটি যে কোন অর্থেই সত্য। মন্দোদরী আমাকে বলল বন্ধুর বদলে বন্ধু পাওয়া কষ্টকর নয়, কিন্তু আজন্ম দেখে আসা বন্ধু, যে প্রেমিকে রূপান্তরিত হয়েছিলো তাকে কোথায় পাবো? তখন আমি আর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করিনি। দরীর ব্যক্তিত্বে এসেছে আমুল পরিবর্তন। সে দিনের সেই ভীরু, সলাজ চাহনির দরী আজ নিজস্ব ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল, নির্ভীক। সে এখন আর মুখে কুলুপ আটা গ্রাম্য বালিকা দরী নেই। অনেক বেশী স্বাধীনচেতা ঘরে বাইরে যে কোন কাজে ওর স্বতন্ত্র মহিমা লক্ষণীয়। পাল্টে গেছে ওর দৃষ্টিকোণ সে সর্বজান্তা সর্বচারিনী, সে সমাজকে অবজ্ঞা করেই এখন জীবনকে উপভোগ করতে চায়।

আশা মিটিয়ে উপভোগ করতে চায় প্রেমহীন রাতের মায়াময় সময়কে। ওর অনুভবে তখন আগ্নেয়গিরির তান্ডবলীলা। গোধূলিতে কষ্টকর স্মৃতির জটলা। এখন চাঁদনি রাতে ব্যর্থ জীবনের হা হুতাশের মেলা। আমি একবার নব্বুইয়ের এই দিনে দরীর দিকে উঁকি দিই। সে গৃহবধু, সে চাকুরে, সে বন্দিতা নারী......। এখন তার গৃহ পরিবেশ সর্বকিছু এতই সুচারুরূপে সাজানো আমার স্থায়ী অবস্থান সেখানে বড়ই বেমানান। ও সর্বত্রই একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে যা যেমন সুন্দর, তেমনই প্রশংসনীয় ও মাধুর্যে ভরা। তার কাছে সময়ের দাম প্রচন্ড। পরিবারে পরিজনের কাছে আজ সে খুবই প্রিয় মুখ। একটা বলিষ্ঠ বোধ নিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে জীবনের সর্পিল রাস্তায়। বন্ধুর সংকীর্ণ গলি এখন রাজপথ। তার নতুন রাজমহলে আমার কোন স্থান আছে বলে নিজের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে না। পুরণো স্মৃতির কথা ভাবার ফুরশত তার খুবই কম বোধ হয়। তার নতুন পরিচিতি খুবই বলীয়ান। মন্দোদরী চৌধুরী এখন একটি এনজিও প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা।

আমার দরী আজ অতীতের সমৃতি। নতুন আসনে সমাসীনা দরীকে পূর্বের স্মৃতিতে খুঁজতে থাকি আমি। আমার বোধে ঘুরপাক চলছে ......। ওর ঘর থেকে রাস্তায় নেমে আসি আমি। অন্তর পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। কি করবো ভাবতে পারছি না। দ'ুচোখ বেয়ে নিজের অজান্তে পানি ঝরছে। জীবনের মতো চোখের জলের ওপরও নিয়ন্ত্রন নেই আমার। দৃষ্টি মাটির দিকে দিয়েও ঠেকাতে পারছি না চোখের পানি। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামী হিসেবে নিজেকে মন নামক জজের সামনে দাঁড় করাই। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সারা শরীর রীতিমতো কাঁপছে। ফরিয়াদ ওর নারীটির সিমান্তে সিঁথির লাল টকটকে সিঁদুর কি সাক্ষ্য দিচ্ছে ও আমার ভীরুতা না অদৃষ্টকে দায়ী করছে। আমাদের দুজনের কারোই জানা নেই। সিঁথির সীমান্তে ধারণ করা এই সিঁদুর কার মঙ্গাল কামনায়? যেমন জানি না আমি তেমনি জানে না তার বর্তমান স্বজন হীরকনাথ মুখার্জী। একটি নিটোল প্রেমকে খুনের অভিযোগে আজ জজের সামনে। জজের আদালতে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এসেছে আমারই একান্তজন। সরকার পক্ষের উকিলের জেরার উত্তরে আদালতকে জানালো ওর প্রেমকে আমি খুন করেছি স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সে বিচার চায়, উপযুক্ত বিচার। নিজের ভালোবাসার মানুষ কী আজ আমার ফাঁসি চাইছে? বিচারক পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকার নির্দেশ দিলেন।

পরবর্তী সাক্ষী হীরকনাথ দরীর স্বামী আদালতে প্রবেশ করতেই পুরো আদালতে পিনপতন নিস্তব্ধতা। ওর সাক্ষ্য শেষ হতেই, প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে এল সেজুঁতি। একে অপরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। চোখের পানিতে ভেসে যাচ্ছে কাঠগড়া, সেটা দেখারও কেউ নেই। এমনি করে সময় পার হয়ে যায়। আমার বিরুদ্ধে সবার সাক্ষ্যে অভিযোগ সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত। কি শাস্তি হবে আমার। বা কি শাস্তি হওয়া উচিৎ? আলোহীন অগ্নির নির্দয় দহনের শাস্তিতো আমি গত দু'যুগ ধরেই পাচ্ছি। দরী বিহীন ক্লান্তিকর নিঃসঙ্গ জীবন বয়ে বেড়াচ্ছিলাম আমি। তখন বিয়ের অনুরোধ তো ওরই ছিলো। দরীকে নিয়ে না পারলেও দরীর ঐকান্তিক চেষ্টায় সেজুঁতিকে নিয়ে ঘর বেঁধে ছিলাম আমি। যদিও সে ঘর, গহীন বালুর চরে ঘর বাঁধা অসহায় কিষাণ কিষানির অসমর্থ কুঁড়েঘরের মতোই। যে কোন মুহূর্তে দমকা বাতাসে উড়ে যেতে পারে।

বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে। কালো পীচঢালা রাস্তা ক্ষতবিক্ষত পিঠ দেখাতে শুরু করেছে। আমি আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়টি দেখাতে পারছি না। অহর্নিশ শুধু ভাবনা আমাদের প্রত্যাশায় কি ভুল ছিলো? তাহলে ভুল প্রত্যাশায় নিরন্তর কেন জ্বলছি আমি? বোধের আকাশে বাউল নক্ষত্র প্রতীয়মান হচ্ছে, ধূসর স্বপ্নে? আবারো জীবন ছবি আঁকে- নূপুর নিক্বণে শুধু স্মৃতির জাবর কাটা। আর কত দিন চলবে এসব। ডুব

সাঁতার, ডুব সাঁতার দু'টি জীবন কি শুধুই ডুব সাঁতারে শেষ হয়ে যাবে। আমি জানি ডুব সাঁতার ছাড়া অন্য কোন সহজ পথ এখন আর আমাদের সম্মুখে খোলা নেই। সেজুঁতি দরীর বন্ধু ছিলো, ওর অনুরোধে আমার জীবন সাথী হয়েছে। প্রথম প্রথম ক্ষত স্থানের ওপর আলগা চামড়ার সৃষ্টি হয়েছিলো। কিছু দিনপর নাশুকানো ক্ষতের চিন চিনে ব্যাথা অনুভূত হচ্ছে। আমি আর সেজুঁতি নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছি একটা সমাধানে পৌঁছতে।

মেঘের পরশে বৃষ্টির সুনিবিড় কান্না বারিপাতের জন্ম দেয়। তা বন্যা হয়ে চারদিক ভাসিয়ে নেয় লোকালয়গুলো পানিতে ডুবে গিয়ে নীলাকাশ ছুঁয়ে দেখে। আমি হৃদয় সমুদ্রে ডুব দিয়ে দেখি চিত্রপুট জুড়ে... শীতভোর-মুখর সন্ধ্যা, কবিতা নন্দন। মেঘ বালিকার ঘরে ছুপিসারে ডানা মেলে এক সুদর্শন । সেই সুদর্শন এক সময় শক্ত সামর্থ যুবকে রূপ নেয়। ভরা নদী নারীর মতো কথা বলা শুরু করে। কিন্তু নারীরূপী নদীরা কেউ জানে না, দিনে দিনে কত শত ঢেউ বয়ে গেছে। প্রতি মন্থনে ফেনিয়ে ওঠে আবার বুদ বুদ আকারে মিলিয়ে গেছে। তবুও মন্থন সমগ্র যৌবন ব্যাপি। দরী পরবর্তী শীতের রাত গুলোর কথা আমার মনে পড়ে। প্রতিদিন সেঁজুতির কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়া। যান্ত্রিকভাবে মিলিত হওয়া। নিত্য দিনের অভ্যেসের মতো প্রেমহীন মেলা মেশায় নিশ্চিত দু'জন। এই মিলনের ফসল হিসেবে আরো দুটো জীবনের পৃথিবীর আলো বাতাসে অংশীদারিত্ব । এত আয়োজনের পরও শান্তির সুবাতাস বইছে না কেন? আমি আর সেজুঁতি নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছি একটা সমাধানে পৌঁছতে। দু'জনের অলিখিত আপোষ চুক্তির মধ্যে সহঅবস্থান চলছে।

সময়ের হিসাব কষতে বসি আমি কীভাবে একটি সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়, চলে যায় দিন। গল্পের গভীরে নবজাতক হাটে। প্রেমহীন জৈবিক নড়াচড়ায় জীবনের বিস্তার ঘটে। হাসে, কাঁদে গল্পহীন গল্পগুলো বাসা বাঁধে পুরাণো অনেক গল্পের মতো সাহিত্য বাসরে। নদীর কোল ঘেঁসে বেড়ে ওঠা চরে মানুষেরা হাসে। কোন কোন সময় ঝিনুক কুড়ায়। ভালোবাসা পাবদা-পুটি -বকের ঠোঁটে ইতিহাস হয়ে যায়। যেমন করে সময় আর সমাজ ব্যবস্থার শিকার হয়ে ইতিহাস হয় দরীর নিখাঁদ ভালোবাসা। পাশাপাশি বেড়ে ওঠা দু'জন মানুষ ধর্মের যুপকাষ্ঠে বলি হয়ে যায়। প্রিয়জনের স্নেহ সাহসী না করে, একটি দুরন্ত যুবককে ভীরুতে পরিণত করে। এমনি করে সোনারঙ গ্রামের কোল ঘেষে রজত রেখা নদী বয়ে যায়। তীব্র স্রোত নেই অথচ অন্তহীন বয়ে যায়। এই বয়ে যাওয়া কী অনন্তকালের? এসব কাহিনী একবার শেষ হয়, আবার নতুন করে জন্ম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। সাহিত্য রচিত হয়, সংস্কৃতিরপেট মোটা হয়। স্ফীত উদর নিয়ে বিগত যৌবনা নারীরা যেমন রঙ্গঢঙ্গ করে তেমনই ফেলে আসা ভালোবাসা কামনার ছোঁয়া ছাড়াই মাঝেমধ্যে কথা বলার চেষ্টা করে। আমার ভাঙ্গা ঘরে এক চিলতে চাঁদের আলো প্রবেশ করে।

নিরুপায় আমি অচেতন ঘুমের মাঝে দরীর স্পর্শ সুখ উপভোগ করি। ক্লান্ত অবশ শরীরে চেতনা ফিরে এলে বাহু জোরে সেজুঁতিকে আবিস্কার করি। তৃপ্ত শরীর আর মনে আবার জ্বালা । আবার অবসাদ।
অলস দুপুর বৃক্ষডালে শরীর মাপে-বেড়ে ওঠার স্বাদ দেবদারুর মত আকাশ ছোঁয়। এইতো গত কাল সে শিখেছে বড় বড় বৃক্ষশরীর চেখে দেখার। অভিন্ন সব গল্প ? সারবস্তুহীন হাড্ডিসার নবজাতকের মতো বেড়ে ওঠে সে মাপজোক শেখে না । বেদনার কথা হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণের কথা ওরা জানে না । চোখের আড়ালে অজানাই রয়ে যায়। কল্পনা অলস বদনে আমি ঘাটের জলে নুড়ি -বালি নাড়ি। এরি ফাঁকে কখন জোয়ার এসে টেনে নিলো আমার সাধের কাগজের নৌকাটি। যেটি যত্ন করে একদা ভাসিয়েছিলো আমার প্রেয়সীও। 'আমার পাশের বাড়ির মেয়েটি। আমি জানিনা। যেমন জানে না আমার শত জন্মের প্রেয়সী। মনে পড়ে আমার তখন একুশ বছর বোধহয়, দরী অষ্টাদশীর ছোঁয়ায়।' নিশির ডাকে ঘর থেকে বেরিয়েছি। ঘন আমবাগানের মধ্য দিয়ে যেতে গিয়ে গা ছমছম করে উঠল অচেনা পথ নয় তাই ভরসা।

ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে বাগান জুড়ে। গাছের ফাঁক দিয়ে যেটুকু চাঁদের আলো পড়ছে তাতে দেখলাম একটি ছায়া আমার দিক অগ্রসর হচ্ছে। কাছে আসতেই দু'জনে একাকার। পাথরের মধ্যে দিয়ে তীব্র গতিতে যেমন পাহাড়ি নদী বয়ে যায় তেমনই আমার শরীর থেকে বেরুনো স্রোত দরীর শরীরের সোনারী তট অতিক্র করে বয়ে চললো। আবরণহীন বাধা বন্ধনহীন উদাসিন গতিতে বয়ে যাওয়া। একই সঙ্গে অনর্গল হল একটি মধুর শব্দ। ধরণীতল আশ্রয় দিলো দু'টো উদ্দাম তরুণ তরুণীকে। শ্বাস প্রশ্বাস গভীর হলো। ক্ষণিক পরে প্রশান্তি, বর্ণনাতীত। এভাবে বহুদিন। এই একান্ত প্রহরগুলো আমার জন্যে আজ খুবই কষ্ট কর।

জীবনের এই সব খন্ড চিত্র , বিশাল ক্যানভাসের এক একটি উজ্জ্বল রঙ। তিনদশক আগে তখনও অষ্টাদশী আমার তখন একুশ। আঠারো বছর বয়সটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই আঠারো আর একুশ বড়ই দুরন্ত। আঠারো বছর বয়সে অনেক ছাড়পত্র পায় নারী। রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করা যায়। সিনেমা হলে অ্যাডাল্ট ছবি দেখা যায়। এ সময় প্রতিদিন সৃষ্টির সূচনায় অবগাহন করা যায় । আমার কাছে আনাড়ীর আলপনা আঁকার মতো মনে হলেও দরীর কাছে অন্য প্রাপ্তি। সে বড় হয়েছে, আমাকে বললো আর কোন বাধা নেই। এবার আমাদের কেউ ঠিকাতে পারবে না। আজই আঠারোতে পা দিয়েছে দরী। গ্রামীন পরিবেশ এ ঘটা করে জন্ম দিন উদযাপনের চল নেই। তবুও কাক ডাকা ভোরে তাকে উইশ করতে এলাম। উইশ এর জবাব উষ্ণ অধরের আদর ভরিয়ে দিল দরী। আকাশের মেঘ যেমন প্রতিদানহীন অবস্থায় উষর মাটির অন্তর ভিজায় শিক্ত করে মাটির নরম শরীর। আমার ভালোবাসায় ক্রমে বিদ্ধ হতে, এখন প্রায়ই আসে মন্দোদরী। আমাকে প্রতিনিয়ত বলে তোমাকে বয়ে নিয়ে আশ্রিত হতে চাই সুদূর সৃষ্টিশীল আকাশের ঠিকানায়। পতাকার স্বর্ণলাল ইষ্টক বর্ণ হয়ে যায় দরী এখন আমার এক মহামুল্যবান বস্তু কৈশোর উত্তীর্ণ নারী। দেশের স্বাধীন পাতাকা, পতপত করে ওড়ে যেমন আমার হৃদয় মন্দিরে আঘাত হানে আমি শিহরিত হই। দরীর প্রেম আমার কাছে তেমনি হয়ে দাঁড়ায়। ওর প্রতিবারের স্পর্শ আমাকে শিহরিত করতে করতে চরম আনন্দে পৌছে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে যখন ফিরে এসেছিলাম স্বাধীন স্বদেশে, ডিসেম্বরের সেই তীব্র শীতে আমার শরীরে উত্তাপ ছড়িয়ে ছিলো মন্দোদরীর নিঘাত প্রেম। শুদ্ধ অগ্নি যেমন সোনাকে পুড়িয়ে খাঁটি করে তেমনি বিচিত্র প্রাণরসে, সৃষ্টির প্লাবনে সকল শূণ্যতা পুরণ করে আমার জীবনে খুশির ঝলক এনেছিলো মন্দোদরী। ফল্গুধারার মত কলমের টাপুরটুপুর পতন মন্দোদরীতে হয় ফুল, হয় আগল ভাঙ্গার কুজ্ঝটিকা। ওকে পেয়ে আমি ঝড় হই, কবিতা লিখি মাটি ও মমতার। সেই কবিতা সখ্যতা আরো গভীর করে দু'জনের। বিরামহীন শিশিরের মত ভাব প্রকাশের উদ্দাম জোয়ার দু'কূল প্লাবিত করে দেয়। তারপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়। জীবনের বেগ, আবেগ দু'টোই অগ্রগামী হয়। সময় যতো বুড়ো হয় আমরা ততো নিকটবর্তী হই। দরীর প্রথম নারী হওয়ার দিনটির স্বাক্ষী ও আমি। এভাবেই চলছিলো। কত শত মুহূর্ত একত্রে কাটানো। জীবন আর যৌবন তখন একাকার। এক নিমিষের অদেখা তখন মনে হতো শতবর্ষের অদেখা। ওদের আর আমদের বাড়ির শত হাতের দুরত্ব তখন মনে হতো যোজন যোজন দুরুত্ব।

লালটুকটুক সূর্য উঠার দিনে, স্বাধীকার ফিরে পাওয়া দিনে, আমি আর মন্দোদরী একত্রিত থাকি। অবসরে আনন্দে বিজয়ের সোনালীক্ষণে মন্দোদরী শুধুই আমার। মন্দোদরীর পেলব শরীর হাতড়ে বেড়াই আমি। ভালোবাসার মুগ্ধতায় ওর শরীরের বাঁকগুলো অতিক্রম করার আনন্দ, সীমা খুঁজে পায় না। এ যেন আমার অর্জিত স্বাধীনতার মতোই অন্তর দিয়ে কেনা। এত বিশাল এত ব্যাপক অপরিমেয় প্রেমের দ্যোতনা। বিস্ময়ে অবাক লাগে আমার। প্রিয় সান্নিধ্যের ফাল্গুন দিনে আমি ছুটে যাই এক লড়াইয়ের ময়দান থেকে বারুদের গন্ধবিহীন অন্য যুদ্ধের মাঠে। তখনও জীবনের কদর্য অর্থ শিখনি ..... তাই অভিমান ছিল খুউব।

এরি ফাঁকে বড় অসময়ে মন্দোদরীকে হারিয়ে ফেললাম আমি। সাম্পানের পালের সাথে বাতাসের সন্ধি কতকালের প্রাচীন তখন বুঝতে পারিনি আমি। সবচে' উদাসী সমুদ্রের মন; অদ্ভুত ঐশ্বর্য ভুলে, আনমনা থাকে সে সারাক্ষণ ঠিক আমার মতো। জাহাজ যখন তীরে ভিড়ে তখন কোমল মাটির গালে চিহ্ন আঁকে নোঙরের দাঁত। জেলেরা মাছের মোহে তুফানের রাত গুলো পেরিয়ে যায়। কিন্তু আমি পারিনি প্রিয়ার জন্যে তুফানের রাত পার হতে।

সময় সমাজ আর স্বজনের অপাত্য স্নেহের দাবীর কাছে প্রেয়সীর ভালোবাসা হার মানে। স্বাভাবিক নিয়মে যা হওয়ার কথা ছিলো না। দরীর দৃঢ়তা থাকলেও যুদ্ধজয়ী আমি জীবন যুদ্ধে সাহস হারাই। ফলে বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা আমাকে প্রত্যাখান করে। এমন আর কত জন আছে এ পৃথিবীতে জানি না। হয়তো অগুণতি। ভীরুতার কারণে আবাল্য একত্র বেড়ে ওঠা পাশের বাড়ির মেয়েটি, আমার পর হয়ে যায়। নদী মাতৃক সোনারঙের ছেলে আমি দেখেছি। বড়শি ও জালে জ্বলে তরতাজা ফুলকার লাল রঙ। খেয়াঘাটে চিরদিন দাঙ্গা লড়ে শুটকি আর নুনের দালাল। সব কথা বুকে চেপে, গতিকে দেবতা মেনে জীবন চলতে থাকে। থামার নিয়তি নেই, রোদ-বৃষ্টি -কুয়াশায় জীবন বইতে থাকে। হাঙর -কুমির ওঁত পাতে জোয়ারের - ভাটায়, অতিকষ্টে মুক্তো পুষে ঝিনুকেরা চুপচাপ কী যে সুখ পায়! সে কথা মন্দাদরীকে কখনও বলতে পারিনি আমি। বর্ষার এক ফোটা আশায় ঝিনুকরা যখন হা করে পরম তৃষ্ণায়, তখন বৃষ্টির একটি কনা ঝিনুকের পেটে ঢুকে মুক্তার জন্ম দেয়। প্রতিটি মুহূর্তে ব্যাথায় কাতরাতে কাতরাতে দেহ মন্থিত লালার পরত জমা হয়ে মুক্তোর জন্ম হয়। সেই ভালোবাসার মুক্তো যখন দেহচ্যুত হয়, তখন ঝিনুক আর বেঁচে থাকে না মুক্তটিকে দেখার জন্যে। মুক্তো সংগ্রহকারী লোভীলোকেরা ঝিনুকের পেট কেটে সংগ্রহ করে মুক্তো। ব্যাথার উপশমে কাংখিত মুহূর্তগুলো একত্রিত হয়ে সাদা, রুপালী, গোলাপী মুক্তো রুপে স্বীয় অস্তিত্ব ঘোষণা করে ঝিনুককে গর্বিত করে তখনই ঘটে সকল বিপত্তি।

কখন জীবন থেকে একটি যুগ ঝরে গেলো টেরও পাইনি। ভালোবাসার আলোতে আমার চোখ পথ চিনতে পারেনি। মাঝিরা মোহনা চেনে, দিশারি গাঙচিল আর বয়া দেখে, ওরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। ঝর্ণার পাখিরা খোঁজে নুড়িবাজ পাহাড়ের ঢালু। পেয়েও যায় একসময়। তখন তাদের মহা আনন্দ খাবারের কোন কমতি থাকে না। মুক্তার জন্ম দিতে গিয়ে অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে ঝিনুক। সফেদ অথবা গোলাপী মুক্তাটির জন্যে প্রাণ হারায় সংগ্রহকারীর হাতে। এই সংগ্রহকারী ঝিনুক হত্যা করে মুক্তা বের করে অন্যকে সাজায়। তারপরও ঝিনুকরা শরীরে মুক্তাকে বড় করে। কষ্ট সহ্য করে ধাবিত হয় মৃত্যুপানে। বৃষ্টির এক ফোঁটা পানি যখন সমুদ্রের কাছে অপাংতেয়, তখন দারুন আগ্রহে বৃষ্টির ফোঁটাটিকে শরীরে ধারণ করে ঝিনুক। বিনিময়ে কি পায় সে? ঝিনুকের আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় মুক্তোর জন্ম দেয়ার পর। আমি আমার প্রেয়সি মন্দাদরী এসব কথার সবগুলোই জানি। তারপরও ভালোবাসি, ভালোবাসি। ইশ্বরে অস্তি ত্বের মতো আমার ভালোবাসা বিদ্যমান, তেমনি পবিত্র।

জোছনার ঘোরে ধু ধু চরে মাতোয়ারা ঝিঁঝিঁদের গান- শোনে ঝাউবন, বালিয়াড়ি। ছুটোছুটি কাঁকড়ার কান তখন মাতোয়ারা হয়। এক সময় রাত শেষ হয়, জোছনা বিদায় নেয়। থেমে যায় ঝিঁঝিঁদের গান। যেমন আমার জীবন থেকে থেমে গেছে দরীর গান। এখন শুধু রোদেলা দুপরের তীব্র তাপে সময় ক্ষেপণ। গোপনে কতকাল এভাবে অতিক্রান্ত হবে মন্দোদরীও তার প্রেমিক হৃদয় চৌধুরী তা জানে না একক অনিশ্চত জীবন পারিপার্শ্বিক মানুষ ও সমাজের কথা ওরা ভাবে না। অন্ধের অনুভূতির মতো একটা দুষ্ট আনন্দ তখন ওদের চালিতকরে।। এরপরও চলছে অভিসার। ন্যাশনাল জীবন বীমার তিন স্তরের পলিসির মতো প্রাপ্তির আশায় ভালোবাসাকে ওরা নবায়ন করে।

মধ্য যৌবনে একবার শ্রীলংকায় গিয়েছিলাম। দেখা হয়ে ছিলো দরীর মতো এক নারীর, নীল আকাশের রঙের মিশ্রণে চিত্রাঙ্কিত শাড়িতে জড়ানো কৃশকায় শরীর মেয়েটির সাধারণ শ্রীলংকান মেয়েদের চেয়ে ফর্সা। হাতে লাল চুড়ি। কপালে সাদা টিপ। বৈশাখের আলোহীন দিনেও যেন একটা তেজস্বী সূর্য সে নারী। কলম্বো বোম্বলপাটিয়া বাস স্টপে ইশারায় ডাকছিলো আমাকে। কেন ডাকছে বুঝতে পারি না। কাছে যেতেই বললো, দুঃখিত আপনার নামটা ঠিক আমার জানা নেই বলে ওভাবে ডাকতে স্পষ্ট ইংরেজী উচ্চারণ হলো। আমি আপনার একটু সাহায্য চাই। বৃষ্টির শব্দের মতো ওর কণ্ঠস্বর কেমন রিমঝিম সুর তোলে বাতাসে। আমি ক্রমেই মুগ্ধ হতে থাকি। ওকে বললাম, আমার নাম হৃদয় চৌধুরী আমি একজন বাংলাদেশী। ও কাছে আসে যেমন করে একদিন কাছে এসেছিলো মন্দাদরী তেমনি। বললো আমার নাম সিথিতি, এখানে দাঁড়িয়ে বাস ধরতে পারছি না। যদি দয়া করে একটু অপেক্ষা করেন আমি আপনাদের সাথে গাড়িতে যেতে পারবো। আমি কিছু বলার আগে ও থামিয়ে দিয়ে বলে, শুনুন। আমি ফিরে তাকাই ভালো করে লক্ষ্য করি। পাঁচফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার মেয়েটি, শ্যামলা নয় গায়ের রঙ কালোই বলা যায়। কিন্তু ধার প্রচন্ড তার চেহেরায়, সপ্রতিভ কোনরূপ আড়ষ্টতা নেই। আকার আকৃতি এত সুন্দর প্রথম দৃষ্টিতে চোখ আটকে যায়। বিদেশ বিভুঁই তাই একটু দ্বন্দে পড়ি কি উদ্দেশ্য মেয়েটির। আমার দিধা দেখে ও আবার কথা বলে।

আপনি মালিনকাইনে থাকেন, তাইনা? আমি বলি আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমার সাথে আপনার অনেকদিনের পরিচয়। আমার সাথে অসংখ্যবার কথা হয়েছে এমন। মেয়েটি অনেকটা আশাহত হয় কারণ সেও মালিনকা ইনে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় কাজ করে। যে সংস্থার ফেলো হিসাবে আমি শ্রীলংকা এসেছি। আমার প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলে-কেন? তেমনটি মনে করার কারণ? আমিতো বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মী, কালরাতে আপনাকে দেখেছি।
আমি হেসে ফেলি। আমি হঠাৎ আবিস্কার করি নিজেকে, আমি হৃদয় চৌধুরী। ঘোরের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে ফিরে আসি ওর কথায়। এমন অস্থির অপ্রস্তুত হয়ে ওঠার জন্য লজ্জা বোধ হয়। সহজ হতে খানিকটা সময় লাগে। সেই শেষ বিকেলে কলম্বো বোম্বলপটিয়া বাসস্টপের নিকট কোথায় হারিয়েছিলাম তবে উত্তর পাইনি। শুধু জানি সে মুখ দেখার পর, আমি জীবনের হারানো সুরের রেশ ক্ষণিকের জন্যে হলেও আবার ফিরে পেয়েছিলাম। এখনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাড়িতে মাইলইনক ইননে ফিরি। এখানে ওর চোখে তাকিয়ে স্বর্গের দেখা পাই সে স্বর্গে আরোহনের সিঁড়ি আমাকে কষ্ট করে খুঁজতে হয়নি। যেমন করে দরীর চোখে চোখ রেখে একদিন জানতে পেরে ছিলাম, ভালবাসার নদীতে সাঁতার কাটার কৌশল ও ডুব সাতারের কথা। আলাপের ফাঁকে ওকে জানিয়ে দেই আমি ওর সঙ্গপ্রাপ্তিতে নিরাসক্ত নই বরঞ্চ আনন্দিত। শ্রীলংকান মেয়েটি দরীর মতোই আমার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে সময় নেয় না শ্রীলংকার পাহাড়ী শহর ক্যান্ডিতে আমাদের কাজ ছিলো। ওখানেও সিথিতি আমার সাথী হলো। একসাথে রইল কলাতুয়ার পানি সরবরাহ প্রকল্পের রেস্ট হাউজে। আমরা এক সময় সুখ নামক স্রোতে মিশে যাই। নদীর মোহনার মত প্রসস্ত সেই সুখের সময়টা। শঙ্খচিল বেশে ঝাউবনে গেয়ে বেড়াই ভালবাসার গান। অরণ্যের গহীনে নেচে বেড়াই প্রজাপতি ছন্দে।

খেলা করি নতুন আনন্দ ভুবনে। সেখানেও সিথিতি আমার নতুন দরী আমার জীবনে একটা দাগ রেখে যায় শ্রীলংকা থেকে পরবর্তী মঞ্জিল দিল্লি পৌঁছে আমি একবার সিথিতি একবার দরী ভাবনায় রত হয়। দরীই প্রধান হয়ে ওঠে। আমাদের ভালবাসার ক্যানভাসে কালো রঙ ছড়িয়ে যায় সিথিতে। আমার হৃদয়ের ক্যানভাসে সব রঙগুলো শুষে নিয়েছিলো দরীর বিয়োগ। কালো হলেও রঙ তো রঙই। দরী

চলে যাবার আগের বৈশাখে বাসন্তী পূজার মন্ডপে একত্রিত হয়েছিলাম আমরা তখন একবারো মনে হয় নি আমাদের জীবনেও অকাল রোধন দরকার হবে।

মন্দাদরীর বিয়োগ আমাকে, আমার জীবনকে থমকে দেয়। চলার পথে রশি টেনে ধরে গতি মন্থর করে দেয়। আমার জীবন আলোহীন হয়। আমি ফিরে আসি একাকীত্বে যে একাকীত্ব শুধুই অন্ধকারে ভরা। একযুগ পরে আজ ওকে দেখার পর এলোমেলো শব্দগুলো ছন্দময় হয়ে ওঠে। নিজ মনে কবিতা আবৃত্তি করি আমি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, মন্দাদরীকে খুঁজতে খুঁজতে পাগল পারা হতে ইচ্ছে করে, যদিও জানি দরী এখন আর আমার নেই। এক সময়ের গভীর নৈকট্য, এখন কি ঘৃনায় রূপান্তরিত? অথবা নৈকট্য ছিলো বলেই তীব্র বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়েছে এখন। যদি খুঁজে পাই তাহলে আজ এই মুহূর্তে ওর প্রতিক্রিয়া কি হবে? প্রথম কোন কথা হবে? কি বলবো ওকে আমি? যাবো কি আমি ওর সম্মুখে? কত কষ্ট দিয়েছি ওকে আমি। ভালোবাসার প্রতিদানে আঘাত করেছি। প্রতিশ্রুতি করেছি ভঙ্গ। ওর উচ্ছল সুন্দর বেগবান জীবনে বঞ্চনার বিষবাস্প ছড়িয়েছি আমি। অপরাধী মন নিয়ে ওর কাছে যেতে সংকোচ হচ্ছে বার বার। সংকোচন প্রসারন্তে ক্লান্ত আমি।

তারপরও মন মানে না। মনে হয় প্রিয় বান্ধবী দরী সব সময়ের জন্য শুধুই আমার। ভোলা যায় না আজ ওর হৃদয়ের উত্তাপ বোঝার কোন উপায় নেই-আমার। তাই প্রশ্ন থেকে গেল ভালোবাসা কি শুধু উত্তাপপ্রদায়ী? শুধু খুঁজে নেয় অরণ্য-গহন? ভালোবাসার হিসেব থাকে না- কেমন করে, কোন পরিবহনে পোঁছাবে তার অভিষ্ট গন্তব্যে। রোদেপোড়া ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী ঘরে কি ভালোবাসা পোঁছাবে না? গলিত উত্তপ্ত লোহাকে নাড়াতে আজ আমার দারুন ভয় লাগে, কোথায় গিয়ে দাড়াব আমি। জীবনে আজ দু'জনেই সুপ্রতিষ্ঠিত গাড়ি, বাড়ি অর্থ বৈভব বিত্ত সবই আছে, তবুও কি যেন নেই! আমার জীবনে সেজুঁতিকে জুড়ে দিয়েছিলো মন্দোদরী। ভেবেছিলাম দরী পর্ব শেষ করার যাবে কিন্তু যায়নি।

বার বছর আগে শেষ দেখার দিন, আমার প্রতি দরীর অনেক অনুযোগ উত্থাপিত হয়েছিলো। বড্ড বেশি বেপরওয়া দায়িত্বহীন, ভীরু। অনুযোগ গুলোতে খানিকটা সত্যি অবশ্যই আছে। তবুও বিচ্ছেদটা ঘটে যাওয়ার এত বছর পরেও দরী কি ঘৃনাটাকে জিইয়ে রেখেছে? না কি ভালবাসার অবশিষ্ট কিছু এখনও আছে? ফারমেন্টেড প্রেম? আমি আর ভাবতে পারি না। দরীর কথা মনে এলেই আমার চার পাশের সব আলো নিভে যায়, ভরদুপুরে আমি রাতের আঁধার টের পাই। বুনো রাতের মিষ্টি গন্ধ আমাকে উন্মাতাল করে দেয়। তখন সময় সুযোগ পেলে সেজুঁতিতে দরীকে খুঁজি।

আজ সময় কে নিঃশেষ করার মানসে বৃষ্টি ভেজা শহরের এ প্রান্তে আমার দপ্তরে এসে বসলাম। জানালার পাশে এসে চোখ রাখলাম কাচের ওপর। বাইরে নিকষ আঁধার ছাড়া কিছুই এখন দৃশ্যমান নয়। তবুও তার মাঝে হঠাৎ হঠাৎ আলোর ছটা দেখা যায় । আকাশের বিদ্যুৎ এখন খুবই দুর্বল। কাচে ভেসে ওঠে প্রতিবিম্ব। স্পষ্ট নয়, তবে আমারই। ঝাপসা ঝাপসা। বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে আসছে। দরজা খুলে দিলাম, টাটকা বাতাস, বাতাসের শীতল স্পর্শে কোন কৃত্রিমতা নেই। বুক ভরে শ্বাস নিলাম জোরে - বেশ জোরে। বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘহীন আকাশ আমাকে সাহসী করে তুললো মন্দোদরীর খোঁজে বের হবো। অন্তরের দারুন আকুতি। আবার যদি আমি আর মন্দোদরী এক হয়ে যেতে পারতাম! তবে বেশ হতো। ভালবাসা আর বন্ধুত্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, অন্তহীন ভাবনা। অভিন্ন পরিবেশে, অভিন্ন বাড়ির আঙ্গিনায় দু'জন বেড়ে উঠে ছিলাম। ছোট বেলার খেলার সাথী, বয়স বাড়লে বন্ধু হলাম , তার হৃদয় বিনিময় দু'জন দুজনের।

পুরণো কথা স্মৃতিতে এলে সে গুলো ভাবতে মন্দ লাগে না। কখনও-কখনও যদিও খারাপ লাগে। স্মৃতি তো সতত সুখের নয়। তার মধ্যে দুঃখ বেদনার ভাগও নিতান্ত কম নয়। দরীর বিয়ের পর যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে খুবই কষ্টকর অবস্থায় পড়তে হয়েছিলো আমাকে। প্রথম বছর দুই মনে অভিমান। হীরক আর দরীর একত্রে জীবন চলার চেষ্টা ইত্যাকার কারণে আমরা দুরে দুরে রইলাম। কিন্তু এক পলকের জন্যে ও মনকে মানানো গেল না।

ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও একা চলা জীবনের বহুমাত্রিক বিষয়। ভালবাসা অনেকটা মমত্ববোধ দিয়ে একজনের সাথে অপর জনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ভালবাসা যে কোন কিছুকে সুন্দরকে দেখতে শেখায়। হিংসা হানাহানি থেকে দুরে থাকতে সহায়তা করে। ভালবাসা সুন্দরতম , পবিত্র, এর ব্যাপকতা অনেক। আমার কাছে ভালোবাসা জীবনের সুন্দরতম অনুভূতি। সম্পর্কভেদে এর রকম ফের হয়। মানুষ নিজের প্রয়োজনে বন্ধু খোঁজে, নিজেকে যখন সে ঠিক বুঝতে পারে না তখনই সে বন্ধুর কাছে যায়। বন্ধুর কোন স্বার্থ থাকে না শুধুই শুভ কামনা। মানুষের জীবনে একা চলা প্রায় অসম্ভব। একা চলতে গেলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। বন্দুত্ব হলো বিশ্বাস কমিটমেন্ট, অনুভূতি শেয়ার করার জায়গা। মানুষের জীবনে তাই অন্তঃত একজন বন্ধু থাকা দরকার। মন্দোদরী আমার তেমনই একজন বন্ধু। এ বক্তব্য গুলো আমার নয় একদা মন্দোদরীর। যখন ও এগুলো উচ্চারণ করেছিলো সে দিন, কল্পনা করতে পারিনি আমাদের বন্ধুত্ব প্রেমে রূপান্তরীত হবে। তারপর কোন একদিন আমি আমার মন্দোদরীকে হারিয়ে ফেলব।

বান্দবী মন্দোদরী আর আমি পাশাপাশি চলতে গিয়ে কি এক আকর্ষণে, মন্ত্রমুগ্ধ গানে মোহিত হয়ে হাজির হই ভালোবাসা নামক পান্থশালায়। সেখানে ভালোবাসার পেয়ালায় জোরে চুমুক দেই টেনে নেই সবটকূ অমৃত। পাত্রে পড়ে থাকলো কি তার হিসেবে কষি না। মনে হয় হারিয়ে ফেলেছি সব তাল। তখন বয়ঃ সন্ধিকাল। একদিন ভালবাসার ঘরের তালা ভেঙ্গো ছিলাম দারুন আগ্রহে আগ্রহ এক সময় আগ্রাসনে পরিণত। সে আগ্রাসনকে আজ ভুলি কেমন করে? দরী প্রথমে ছিলো শুধুই বন্ধু। বন্ধুত্বের স্ত র পার হয়ে একদিন রূপান্তরীত হয়েছে প্রেয়সীতে। স্বীকৃতি না থাকলেও বধু হয়ে ছিলো একটা সময়ের জন্য। এই উত্তোরণ না হলেই মনে হয় ভালোছিলো।

জীবনের জটিল গ্রন্থি সমুহ অতিক্রম করা সম্ভব হলো না আমার। কঠিন পাঁকের পঙ্কিলতায় জড়িয়ে গেলাম। যেদিন সে ছোট ঠাকুর বাড়ি ছেড়ে ছিলো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। সারা ছাদ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে হেমন্তের সবে ওঠা সূর্যের নরম আলো-। ছাদের কোনে আমার শরীরে ভার রেখে দাড়িয়ে আছে দরী। ছাদের টবে রাখা ফুলের ওপর, গাছের পাতায় ভোরের শিশির তার সমস্ত পবিত্রতা নিয়ে উন্মুখ হয়ে আছে মিলিয়ে যাওয়ার জন্যে। দরীর কান্না ভেজা চোখ দুটো ভোরের শিশিরের মতোই পবিত্র। বললো হৃদয় তুমি কি আমাকে মুক্ত করে দিলে? এখনৌ সময় আছে চলো অন্য কোন লোকালয়ে যাই।

তখন মনে পড়ে গেলো কী প্রচন্ড আবেগ নিয়ে একদিন আমরা হয়েছিলাম বুনোহাঁস। দরীর কথার কোন জবাব নেই আমার আমি নিশ্চুপ রইলাম। শিশিরে ভেজা ঘাস মাড়িয়ে আজ চলে গেল আমার দরী। সময়ের গতিতে কালের রঙ বদলে যায়। দরীর শরীরে এখন কোন রং ধুসর নাকি সাদা? তা আমার জানা নেই। নীল শাড়ির আবরণে জড়ানো সেদিনের আমার প্রিয়তমা এখন কি হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে? এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

প্রায়ই বিনিদ্র রজনী কাটে আমার। ভাবনার ক্লান্তি চোখকে প্রায় নির্ঘুম করেছে। রাতশেষ হয়ে এসেছে নির্ঘুম চোখে আমি দেখি মেঘবালিকার ঘর থেকে সুদর্শন যুবকের প্রস্থান। নিপুন নিড়ানীতে ক্রমশ.... ক্ষয়ে গেছে দীর্ঘ সময়। সযত্নে প্রোথিত হয়েছে যত্নে লালিত স্বর্ণপ্রভা বীজের শরীর। মুছে গেছে রামধনু ...। ক্যানভাসে সুনিপুন ভোর, অশোক সন্ধ্যা। এইসময় স্ত্রীপুত্র কন্যা সবাই ঘুমের মধ্যে আত্মসমর্পন করে আছে। আমি শুধু বারেন্দার চেয়ারে বসা। সকল কিছু ভুলে প্রিয়বান্ধবীর সান্নিধ্যে ফেলে আসা স্মৃতি চারণ করছি। পূর্ব দিক থেকে মৃদু মন্দ বাতাস বইতে শুরু করেছে, ক্ষণকাল পরে দিগন্ত রেখায় দেখা দেবে আলোর আভাস। ধ্রুপদী বেদনা থর থর থর... করে জানান দিবে অপার ভালোবাসার। আমি কান পেতে রই ভোর রাতের বেহালায় কে যেন করুন সুর তুলেছে তার ইন্দ্রজালে আমি শুনতে পাই মোহন সর্বনাশের ছোঁয়া। ভুলের মিছিলে গা ভাসাতে মন্দ লাগে না।

ভুল প্রত্যাশায় জেগে থাকা রাত। কাঁশফুলে ছেয়ে যাওয়া নদীর ভাঙ্গাণ কবলিত সোনালী তট আমার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয় আমি দেখতে পাই হালকা হাওয়ায় মৃদুমন্দ দুলে আদর নিতে চাইছে সাদা কাশফুল গুলো। বেশ খুশি দেখাচ্ছে কাশফুলগুলোকে, ঠিক রমণের পর দরীর মতো। আমি দেখি মন্থনে ফুলে ওঠা ফেনিল ত্রিভুজ অনুভব করি কোমল অষ্টের প্রতিটি আক্ষেপ আলোড়ন। বেলা বাড়তেই আবার বৃষ্টি নেমেছে। ইচ্ছে করে বাতাসে ভেসে বেড়াবার। কিন্তু জীবনের সাথে ঠিক তাল মেলাতে পারছে না বৃষ্টি। বিগত সন্ধ্যা রাতে একটি এনজিও অফিসের চায়ের আড্ডা থেকেঘরে ফেরার তাগিদ অনুভব করেছিলাম। তখন এই বৃষ্টি ছিলো বড় তেজহীন। মাঝে মাঝে বড় দু একটা ফোঁটা ঝড়ে পড়ছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা, বেশিরভাগ দোকানের ঝাঁপ নামানো। লোকজন তেমন একটা নেই। এমন একটা সন্ধ্যায় পথ চলার আনন্দটা অনেক পুরোনো। কিছু বছর আগে বৃষ্টি ভেজা এমন আলো আঁধার সন্ধ্যায় আমরা পাশাপাশি হেঁটেছি। কৈশোরে সকালে বৃষ্টি এলে পড়ার ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়তাম সর্পিল পথের ঠিকানায়। পড়া ফাঁকি দিয়ে বৃষ্টির পনিতে ভিজবার অপরাধে শাস্তি দিতেও ভুল হতো না মায়ের।

আমার গায়ে বৃষ্টির ছোঁয়া লাগাতে বড় অনীহা তার। মায়ের কোলে থাকতে বৈশাখী ঝড়ে বৃষ্টি স্নাত হয়ে একবার নাকি মরতে বসেছিলাম। এ বছর আমার সেই জন্মদাত্রীও হয়েছেন গত। কৈশোরে বৃষ্টির মাঝে বাড়িসংলগ্ন পুকুরে নামতাম দারুণ মজা নিয়ে। পুকুরের পানির উষ্ণতা অনুভব করতাম শরীরে। দু'জনের দুটো মসৃন শরীর পুকুরের পানিতে উষ্ণতা খুঁজতো। বেশি আনন্দ হতো যখন সাঁতারের ফাঁকে দরীর শরীর জড়িয়ে থাকত আমার শরীরে। বৃষ্টিতে ঠান্ডা লেগে সন্তানের শরীর খারাপ হবে তাই মায়ের যত ভয়। অথচ আমি চিরকাল বৃষ্টি বিলাসী। বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায় মালা গেঁথে শরীরে জড়ানোর সুখ যে আমায় টানে। আমি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাঁটতে থাকি।

এক সময় আমি কেমন যেন আনমনা হয়ে যাই। মন্দাদরী বলতো বৃষ্টিতে আমি নাকি সবসময় অসিন্ধ কিছু খুঁজি, সুযোগ পেলে তখন অধর মেলাতে দেরী হতো না। কি খুঁজি জানতে চাইলে ও বলতে পারতো না শুধু নত দৃষ্টিতে চোরা চাহনির আহ্বান ছাড়া। চার দিকে কেউ আছে কিনা সে খেয়াল থাকতো না। দু'জন তখন দু'জনে মত্ত। সুস্থি হলে আমি হেসে বলতাম, তোমাকে খুঁজি। বৃষ্টির ফোটা আমার শরীরে দরীর স্পর্শ হয়ে বিঁধে গেলে যন্ত্রনাদায়ক সুখে আবিষ্ঠ হয়। দরীকে বুকে জড়িয়ে আমি স্পন্দিত, শিহরিত হতাম। আজো বৃষ্টির ছোঁয়া আমাকে সেই অনুভূতি এনে দেয় আমি চোখবন্ধ করে দরীকে অনুভব করার চেষ্টা করি।

মন্দোদরীর মত বৃষ্টিও আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় পৃথিবী থেকে চোখ খোলার পূর্ব পর্যন্ত সে আবেশ জড়িয়ে থাকে। ওর সাথে আমার প্রথম দৃষ্টি বিনিময় কখন হয়েছিলো মনে নেই। তবে হয়তো কোন

বৈশাখে হয়ে থাকবে। দৃষ্টি বিনিময় ক্ষণে সেদিন বৈশাখী ঝড় ছিলো শান্ত। তবে অন্তর হয়ে ওঠেছিলো টালমাটাল। একদিন কৈশোরে পাঠশালা থেকে ফেরার পথে বৃষ্টির তান্ডবে ভিজে একাকার আমরা, সহপাঠী বন্ধুরা। অন্যদের বিদায় দিয়ে আমি নির্বিকার হাঁটছি। ঘটকের বাড়ির চত্বরে এসে শুনতে পেলাম কেউ একজন ডাকছে, এই যে হৃদয় শুনছো। এ ডাক দাদোর স্টেশানে চারুদত্ত আধাকার শুনে ছিলো। পাশের বাড়ির মন্দির সংলগ্ন একটি ছাউনি থেকে একজন সদ্য কিশোরীর আহ্বান। সাদা নীলের হাফ প্যান্ট ফ্রগ বৃষ্টিতে ভিজে শরীরের সাথে লেপ্টে আছে। কিশোরী শরীর অচেনা মাদকের আসক্তি ভরা। বই খাতা ওদের কাচারীতে রেখে দু'বাড়ির মধ্যবর্তী পুকুরে নামলাম আমরা। বৃষ্টি ভেজা প্রকৃতিতে তখন দারুণ শীত। পুকুরের পানির উষ্ণতায় আর দরীর শরীরের মাদকতা আমি পথ হারালাম- সেই শুরু, তারপর কত পথ একত্র হেঁটেছি মনে নেই। দীর্ঘদিন একত্র হাটার পর ধর্মত্যাগ করতে সম্মত ছিলাম দু'জন তবুও কিছুই হলো না। কারণ আমি ছিলাম ভীরু।

সকল জন্মের সাথীকে পথে রেখে লোকালয়ে ফিরেছি আমি। রেললাইনের মত সমান্তরাল এগিয়ে চললাম সমাজ, সংস্কার, দু'পরিবারের সম্মান এসব মেকি হৃদয়হীন ব্যাপার স্যাপার। মন্দোদরীর মা অর্থাৎ আমার শান্তনা কাকীমার অশ্রুপাত, সত্যকাকার স্নেহের প্রতিদান, ইত্যকার বিষয় সমূহ আর আমার ভীরুতা, আমাদের সম্পর্কটিকে এক মোহনায় মিলাতে পারলো না। দরীর বিয়ের পরও দু'জনের চাওয়া পাওয়ার মাঝে পার্থক্য খুব একটা বেশি ছিলো বলে আমার মনে হয় না। মা-বাবা আর কাকীমা ও সত্যকাকুর অপাত্য স্নেহকে অত্রিক্রম করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই সত্যি। কিন্তু হৃদয় থেকে মন্দোদরীকে আলাদা ও করতে পারলাম না। পবিত্র ভালোবাসা এখন নষ্ট স্রোতের পঙ্কিলতায় আটকা পড়লো।

রীতিনীতি নিয়ম-কানুন সমাজ-সংসার ইত্যকার সব ব্যাপার গুলোর জটিলতায় পড়ে একদা আমি সব হারিয়েছি। কত আনন্দ , কত সুখ আজ চোখ বন্ধ করে পেরিয়ে আসা রাস্তায় ফিরে দেখি আমি অসময়ে বিদ্রোহী। যদিও স্বকীয়তা রূপান্তরিত এখণ পরকীয়ায়। হৃদয় ও দরীর মাঝে হীরক নাথ মুখার্জী নামে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। তার হাতে সমাজের স্বীকৃতির সনদপত্র আছে যেটা আজ ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী। আজ আমার কাছে দরীর আকর্ষণ যতই প্রবল হোক, তার মাঝে অন্য কেহ আছে, সে সমাজ কর্তৃক দেয় সনদে অনেক বলীয়ান। যদিও দ্বিতীয়বার দেখার সময় দরী আমাকে বলেছিলো বিশ্বাস করো হৃদয়-হীরকের ঔজল্য আমার কাছে উত্তাপহীন , উত্তেজনবিহীন প্রতি রমণে হৃদয় তখনো অনিবার্য।

গতকাল শহরের মিশন রোড অতিক্রমকালে গাড়িতে বসা দরীর অপলক দৃষ্টির ভাষা কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হয়েছে আমার প্রথমে স্মিতহাস্য পরে কেমন জানি রূঢ়। আমি বুঝতে পারি বাতিঘর চেয়ে দেখে বন্দরের অন্ধ কোলাহল। যদিও সে কোলাহলের মধ্যে পুরাণো চেনাস্বর খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। ভাদ্র শেষ হয়ে আসছে। দরীকে জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখার পর গত বিশটি দিন আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম। শরতের শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের, প্রকৃতিতে দেখা দিয়েছে না শীত না গরম এ রকম একটা ভাব। এই রোদ এই বৃষ্টি। রোদ বৃষ্টির খেলা, গাঢ় নীল আকাশ আর তার মধ্যে সাদা পেঁজাপেঁজা মেঘের ভেলা, যা দেখলে বিরহী মনও পাওয়ার আনন্দে ভরে যায়। অতিক্রান্ত সপ্তাহে প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত হয়েছে লোকালয়। শরতের সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখা যায় বড় বড় কচুপাতার ওপর মুক্তের মত শিশির বিন্দু।

ঘাসের ওপর পা দিলে শিশির বিন্দু পা ছুঁয়ে যায়। শরৎ মানে কাশফুল আর শিউলির আগমন। শিউলি ফুলের ঘ্রাণে চারদিক মৌ মৌ গন্ধে ভরে যায়। মনে পড়ে আমি আর শৈশবে যখন সোনারং গ্রামে থাকতাম

সে সময়ের কথা। রজত রেখা নদীর পাড়ে শ্যামল ছায়া শোভিত গ্রামটিতে আমাদের স্বর্ণালী শৈশব পড়ে আছে। গাঁয়ে যখন পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম, তখন অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠলে দেখতে পেতাম ঘাসের ওপর হলুদ বোঁটা আর সাদা ফুল পড়ে বাড়ির আঙ্গিনায় একটা সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। কাক ডাকা ভোরে ঘুম থেকে ওঠে দু'জন শিউলি ফুল কুড়াতাম, দরী মালা গাঁথতো।

এখন রাজধানীর রাস্তায় খেয়াল করলে দেখা যাবে, দুর্লভ শিউলি ফুলের মালা বিক্রি করার জন্য ছোট ছোট মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। শাদা কাঁশফুল অপার এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে নদীর পাড়ে। নদীর দু'কুলে ছড়িয়ে থাকে শাদা শাদা কাঁশফুল আশ্চর্য এক সৌন্দর্য। বৃষ্টি, রোদ, বকুল ফুল, শিউলি ফুল, কাঁশ ফুল - সব মিলিয়ে দেখা যেতো এক স্বর্গীয় পরিবেশ। শরত জানান দিতো আগামী হেমন্তের। কৈশোর আর যৌবনের দুরন্ত দিন গুলোতে আমরা একত্রে উপভোগ করেছি বাংলার ষড়ঋতু। পুঁজা পার্বন ঈদ ইফতারি সকল উৎসবে ছিলো দু'জনের সমান আগ্রহ সম অংশিদারিত্ব। আযানের ধ্বনি ভেসে আসলে দরী মাথার কাপড় মুসলীম মেয়েদের মতো টেনে দিতো। প্রেমিকের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ , আমাকে মুগ্ধ করতো।

এখন প্রকৃতির সকল কিছুর মতো, এই শরত ও মাঝে মধ্যে আক্রান্ত হয়। শরতের শাদা মেঘের ভেলায় হঠাৎ হঠাৎ বর্ষার কালো মেঘকে চড়াও হতে দেখা যায় ইদানীং। তবে যত যাই হোক না কেন শরত মোহনীয় হেমন্তের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে এখানো। হেমন্তে বিলীন হওয়ার অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হতে চায় না। এই অপেক্ষার মুহূর্ত বড়ই দীর্ঘ। প্রিয়জনের জন্যে অপেক্ষায় থাকা একটি প্রেমিক মনের কাছে প্রতিটি মুহূর্ত হাজার হাজার মাইলের থেকেও দীর্ঘ। প্রিয়জন কখন কাছে এসে দাঁড়াবে, কখন তার প্রিয় দু'টি চোখে চোখ পড়বে, এই অপেক্ষায় কোনো বাঁধাকেই মানতে চায় না মন, অধৈর্য'প্রেমিকের সময় প্রলম্বিত হয়ে যায়। আর প্রিয়জনের দেরি? ওরে বাবা, তখন সারা পৃথিবীকে মনে হতে থাকে শত্রুপক্ষ, যেন তার প্রিয়জনকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করছে। অপেক্ষার মানুষটি এসে পৌঁছবার পর অভিমান যেন ভাঙ্গাতে চায় না, মনে হয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ অবহেলার শিকার হয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বসে আছে একটি ছোট শিশু একেবারে অবুঝ।

কিন্তু এতকিছুর পর? এতকিছুর পরও প্রিয়জনের জন্যে অপেক্ষার স্বাদ অন্যরকম। তার ভেতরেও মিশে আছে ভালোবাসার অম্ল-মধুর তৃপ্তি। এই মধুর বেদনা অপেক্ষাকে নিয়েই আমি গত বিশটি দিন কাটিয়েছি আমার আশপাশের পরিচিত পৃথিবী ভুলে গেছি আমি। খোঁজ নিয়ে জেনেছি মন্দোদরী, একটি সাহয্য সংস্থার বড় কর্মকর্তা হিসেবে এই শহরে এসেছে। বন্যায় ত্রাণ কর্মসূচী তদারক ওর কাজ। ওর অস্থায়ী আবাসস্থলের সন্ধান পেয়ে আমি সকল দ্বিধাদ্বন্দ আর সময় নামক শত্রুর ষড়যন্ত্র এড়িয়ে কাছে যাওয়ার মনস্থ করি। মন স্থির করে ফেলি, যে যা বলুক, যত অবজ্ঞা আর অপমান অদৃষ্টে লেখা থাকুক আমির ওর কাছে যাবোই। আজ উত্তর চল্লিশে ভালোবাসার অনুভবে শরীর আমার নিকট মুখ্য নয়, মনের দাবীই বড়। তাই উচাটন মনটাকে শান্ত করতে দরীর খোঁজ আমার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে। গত রাতে সকল অলক্ষ্যে ওর আবাসস্থল চিহ্নিত করে এসেছি। গত সারাটাদিন অপেক্ষা করে মনের সকল দ্বিধা সরিয়ে ওর অস্থায়ী আবাসে যখন এলাম রাত তখন আটটা। বয়স বেড়েছে পূর্বের মতো সুন্দর আছে কী দরী? ওর অফিস ঘরের সাজ, বাস্তবতার সাথে সুন্দর রুচি মিশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘোষণা করেছে। দরী তার সংস্থার এখন একজন বড় অধিকর্তা, আঞ্চলিক প্রধান। বাড়িটি কার্যালয় ও বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছু নারী ও পুরুষ কর্মী এখনো কাজ করছে। ওপর তলায় দরীর আবাস। একজন নারী কর্মীর সাথে ওপরে উঠে এলাম।

ঘরটি ছোট অস্থায়ী নিবাস, তবুও ছিমছাম সাজানো। দরীর কর্মীটি আমাকে ওর ঘরে পোঁছে দিয়ে এইমাত্র বিদায় হলো। আজ রাতে আকাশে যখন কৃষ্ণ পক্ষ প্রতিপদের চাঁদ ধীরে ধীরে সর্বস্ব খোওয়ানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তখন আমি আমার প্রিয়সীর আবাসে এসেছি। দরী এসে বসলো একটি সোফায় কুশল জিজ্ঞেস করলো, আমার অবস্থান ও কাজ নিয়ে কথা বলো। ততক্ষণে ঘরের কাজের লোক কিছু জলখাবার দিয়ে গেলো। দরী পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, জান, সত্যি করে বল তো, এত সবের পরেও অতীতে ফিরে যেতে চাইছো কেন? এমনতো নয়, বর্তমানে তোমার কোন আপনজন নেই। হায় বিধাতা! দরীতো জানে না ও ছাড়া আমার জীবনে আপনজনের অন্য কোন সংজ্ঞা নেই। আমি বললাম জান্ মাথা ঠান্ডা করে ভাব, আপনজন কাকে বলে? দরী হাসল, তাহলে মরেছি আমি। আমি প্রশ্ন করি মানে? মানে-তো-তুমি ভালো করেই জানো-জান।

আমি পরিস্কার বুঝতে পারছিলাম হাসতে হাসতে বললেও , কথাটা খুবই সিরিয়াসলি বলছে দরী।
আবারো দরী তাকাল আমার দিকে দৃষ্টি এবারও পূর্ণ। বার বছরের ব্যবধান মুহূর্তে পার হয়ে যায় দু'জনে। এখন দরীর মাথা হৃদয়ের বুকে। হু হু করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে দরী। শরীরের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়েছে হৃদয়ের শরীরে। আনমনা দরীর, আত্মসমর্পণে বিদ্ধ হওয়ার সম্মতি। এই আহ্বান উপেক্ষা করার সাধ্য নেই হৃদয়ের। স্থান কাল পাত্র ভেদ সকল কিছু ভুলে যায় দু'জন।

ল্যাটিন ভাষায় চাঁদকে বলা হয় লুনা। আর লুনাটিক মানে চন্দ্রাহত। যার অন্য অর্থ , পাগলামি। সাধারণ মানুষ যা চায় যে ভাবে চায়। তার থেকে অন্যরকম ভাবে কেউ কিছু করলেই লোকে বলে পাগলামি করছে। তাহলে গোলেমালে কী এইটাই দাঁড়াল না, ওই চাঁদটাই আকাশ থেকে আমাদের মনে একটা অন্যরকম চাওয়ার জন্ম দেয়। কতদিন পরে দেখা। দরীকে দেখে মনে হলো যেন আমার এই আগমন ওর প্রত্যাশিত ছিলো। বললো কেমন আছো? হৃদয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবারও বললো তুমি আসবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কুড়িটি দিন নষ্ট করে দিলে? বার বছরের বিচ্ছিন্নতা যেন কোন কিছু নয়, প্রত্যাশার কুড়িটি দিনই বড়। এ যেন চাঁদে চাওয়া, প্রিয়জনের সাভাবিক প্রত্যাশা। সেই চাওয়াটার ব্যাখ্যা অবশ্য যার যার নিজের মতো।

দরীর আর আমার সম্পর্কের ব্যাপারটাও লুনাটিক। এখন দু'জনের দুটো সংসার। দু'জনই সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত। হৃদয়ের মনে পড়ে কী আনন্দ লাগতো যখন তখন দরীদের বাড়ি যেতে। বড় রাস্তার ওপর সদর দরজা, তারপর দিনের বেলাতেও আলোহীন গাছ গাছালিতে ভরা বাগান পেরিয়ে বিরাট এক উঠোনের এক পাশে একটি নলকূপ, সেই নলকূপের পাশে সব সময় বাড়ির অনেক মেয়েরা কিছু না কিছু করছে। ডাল তরকারি ধোয়া, বড়ি পাঁপড় শুকানো চিরচেনা পরিবেশ। এর মধ্যে এক সময় উঁকি দিতো দরী, তারপর ইশরা ইংগিত এবং এক জায়গায় একত্রিত হওয়া, এরপর শুধুই আনন্দ। আজ কোন নতুন অভিসার নয়। হৃদয়ের দ্বন্দ দেখে, আবারো দরী এগিয়ে আসে, সকল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে, সরাসরি কথা বলে। তুমি সব সময় চোর- যা চাও তা সরাসরি চাইতে পারো না। প্রেম করেছো অথচ লুণ্ঠন জানো না! তবুও কেন যেন শুধুই তোমাকে ভালো লাগে। তোমার বঞ্চনা, প্রতারানা সব কিছুরই একটা সহজ ব্যাখা আমার মন খুঁজে পায়। সব সময় তুমি পার পেয়ে যাও।

- জানো হৃদয়- মন্দোদরীর চাঁদে চাওয়া চোখে ঘোর।
মনে পড়ে এরূপ এক জোছনা ভরা রাত্রের কথা। সেদিন রূপবানী সিনেমা হলে তুমি ছবি দেখতে দেখতে কি কান্ড করেছিলে অন্যরকম মুহূর্তটি তুমি ভুলে গেছো। কথাবার্তা স্বাভাবিক করার কী অপূর্ব ক্ষমতা এই মেয়েটির। মনে পড়ে সেদিনের কথা, কী সুন্দর নরম ওর ঠোট। মুখে কী সুন্দর গন্ধ, আজো মনে আছে।

আমার অধরে ওর অধর। হলে আঁধার তখন খুবই মুগ্ধকর। ক্ষণকালের জন্যে কোন কথা নেই। মন্দাদরী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। এবার আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠি।
-হ্যাঁ তাই তো হতো। শুধু .....। কথা শেষ করতে দিল না দরী।
থাকঃ পুরাণো অযুহাত আর শুনতে চাই না। অশ্রু লুকানো দৃষ্টি নিচু করে পুণর্বার উচ্চারণ করলো, বললে না কেমন আছ? কি বলবো আমি, কিংশুক জীবনে রজনীগন্ধার সুবাস বঞ্চিত একজন মানুষ। তারপরও মুখে কষ্টাজিত হাসি টেনে উচ্চারণ করি ভালো আছি।

মন্দাদরীর সান্নিধ্য মুহূর্তে আমাকে সতেজ করে তুললো আবার ত্রিশ বছর পেছনে ফিরে গেলাম। দুর্নিবার এক আকর্ষণে আজ আবার দরীর মুখোমুখি হয়েছি। শরতের আকাশের দিকে তাকালে আমি স্থির থাকতে পারি না। বিকেলে যখন আমি ওর ঘরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তখন, নীলের মাঝে একটু একটু লাল পুরো পশ্চিম আকাশ জুড়ে আকাশ, গোধুলির আভা পশ্চিমাকাশের সমগ্র ক্যানভাসে। মনে হলো এখন থেকে শুরু হবে বিভিন্ন ফুল ফোটা । দোলনচাঁপা, মোরগ ফুল আরো কত মৌসুমী ফুল। যা দেখা যাবে অনেক ঘরের আঙ্গিনায়। কৈশোরে দেখা বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালি ছবির কথা মনে পড়লো। সত্যজিৎ রায়ের নির্মাণ করা ছবিটিও বিশ্বজয়ী চলচিত্রটি কাকীমার সাথে আমরা দেখেছি । সেখানে দুর্গা আর অপুর দৌড়ে কাশবনে যাওয়ার দৃশ্যটি আজও মনে পড়ে।

ওদের মতো ছোট বেলায় আমরাও আমাদের বাড়ির পাশে ছোট নদী রজতরেখার তীরে কাশবনে হারিয়ে যেতাম। স্কুল ছুটির দিনে খুব ভোরে বেরিয়ে সুর্যের তাপ বাড়লে বাড়িতে ফিরতাম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসতো, আমরা আবার হাজির হতাম রজত রেখার তীরে। সেদিন বিকেলের সোনা ঝরানো নরম রোদের মন্দাদরীকে আজ রাতে বড় বেশি রহস্যময়ী লাগছে। ওর আঙুলে শাড়ি পেঁচিয়ে ধরার ভঙ্গিমা, চোখের তারায় শেষ প্রহরের নীলিমা, বাতাসের দোলায় এলো -মেলো কেশ, পরিচিত প্রেমের ছবি, সবই যেন আজ অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে। এই মায়াবী মুহূর্তে আমি আনমনা হই। ইচ্ছে করে আবারও হারিয়ে যেতে। গহীন বালুর চরে ঘর বাঁধার স্বপ্ন মনে হয় এখনও হারিয়ে যায়নি। কিন্তু আমি কে স্বপ্নের কথা বলবে? আমার আমিকেতো বহু পূর্বে হত্যা করেছি আমি।

একটি প্রিয় কবিতার কয়টি পংতি 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/ চুনি উঠল রাঙা হয়ে / আমি চোখ মেললুম আকাশে জ্বলে উঠল আলো/ পূর্বে পশ্চিমে। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর সুন্দর হলো সে'। মন্দোদরীকে কতবার শুনিয়েছি এই কবিতা, সত্যি কি আমি তাই? তাহলে আমি মন্দোদরীকে সুন্দর করতে পারলাম না কেন? দরীর অস্থায়ী আবাস 'নিরিবিলিতে' নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আমি।। মুখে কোন কথা নেই, সব কথা শেষ হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। বিছিন্ন হয়ে যাওয়া সুতোয় জোড়া লাগাতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। প্রথমে কোন প্রসঙ্গ কি নিয়ে আলাপ শুরু করবো ভাবছি। আমার ইত্যকার ভাবনার মধ্যেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গালো, আমার জনম জনমের প্রেয়সী। বিচলিত হচ্ছো? কি উত্তর দেবো এই অতি পরিচিত বহুল উচ্চারিত প্রশ্নের । অপরাধী মনের মধ্যে দু'টো সত্ত্বা কাজ করছে। সম্মুখে অগ্রসর হবো কি হবো না, সব কিছু ছাপিয়ে উচ্চারণ করলাম।

....না বিচলিত নই। যদিও সত্যি নয়, তারপরও কষ্ট করে উচ্চারণ করলাম বাক্যটি।

পুর্বের যে কোন মিলনের মতোই ঘড়ি দেখল দরী । আগের মত দরদী কণ্ঠে বললো বড় বেশি শুকিয়ে গেছো, খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করো না বলেই মনে হচ্ছে। শরীরের প্রতি এই অবহেলা কেন? উদ্বেগ আকুল অনেক প্রশ্ন, কি জবাব দেবো বা কোনটি রেখে কোনটির জবাব দেবো ভেবে পাচ্ছি না। হীরকনাথ নাকি বলেছে বাসিফুলে দেবতার পুঁজো হয় না, তাই বেশ কিছুদিন পুর্বেই দরীকে বন্ধন মুক্ত করে চলে গেছে। দরী শুনেছে হীরক আবার বিয়ে করে সংসার বেঁধেছে। আমার জন্যে ওর ঘরটাও ভেঙ্গে গেলো। কি করবো আমি? কেন এমন হচ্ছে। দরী এখন মুক্ত বিহঙ্গ এবং দারুণ একা। কথায় কথায় রাত বেড়ে যায়, ঘড়ি কাটা দশটা ছুঁই ছুঁই আমি ওঠব ওঠব করছি। দরী বললো, আজ কিন্তু আমার এখানে খেয়ে যাবে। ভয় নেই রাতে থাকতে অনুরোধ করবো না। আমার উত্তর না শুনেই, দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরালো মন্দোদরী। জানি ওরদুটো চোখে যখন অশ্রু, যা ক্ষণকাল পরেই মুক্তা বিন্দু হয়ে ঝরে পড়বে।

আমার মনের মাঝে ও ঝড় বইতে শুরু করেছে। আমার জন্মজন্মান্তরের নারীটিকে কি করে বলি আমার পুর্বের কথাটি মিথ্যে, আসলে আমি একটুও ভালো নেই, এখন ঘরে দারুণ অসহনীয় নিস্তব্দতা। কত না বলা কথা জমা হয়ে আছে। সব আবেগ, অনুচ্চারিত কথা জমাট বেঁধে আমার কণ্ঠে আটকে গেছে। ও একদিন অশ্রুসজল কণ্ঠে বলেছিলো তোমাকে কোন দিনও মাপ করবো না। আজ জানতে বড়ে ইচ্ছে করে ও আমায় ক্ষমা করেছে কিনা? ওর বার বার অনুরোধে, আমি ওরই বন্ধু সেঁজুতির সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছি। সেঁজুতি আমার জীবনে সন্ধ্যা প্রদীপ হয়েই রয়েছে। ওর উপস্থিতি রাতে কোন সুবাস ছড়ায় না। সেজুঁতি শীৎকার আমাকে ক্ষীপ্র করে না, আমি অগ্রগামী হওয়ার তাগিদ অনুভব করি না। নীতিবিরুদ্ধ হলেও দরীর উচ্চারিত ধ্বনি সমুহ আমাকে আবেগ তাড়িত করে আমি সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠি।

অপেক্ষার প্রহর যদিও কষ্টকর। তবুও সব কথার শেষ কথা হল, 'বেদনা মধুর হয়ে যায় তুমি যদি দাও'। প্রেমের জন্য মানুষ সব কিছুই করতে পারে, এটাই সত্যি। তবে সবার জন্যে সত্যি নয় বোধ হয়। যেমন আমি পারিনি নিজেকে মাঝে মধ্যে নিষ্কর্ম মনে হয়। রাতের শেষে যেমন দিনের আলোয় চারিদিক ভেসে যায়, তেমনি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সব ক্লান্তি নিমিষেই দুর হয়ে যায়। আমি এখন অনেকটা ভাবনাহীন। এই মুহূর্তে শুধুই মন্দোদরী, অন্য কিছু নয়। তাই দরীর বিবর্ণ কালো চুলের মধ্যে, যৌবনের সেই কালো কুন্তল বন্যার মিষ্টি গন্ধ খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। পরিচয়ের সোনালী সময়ের কিছু কথা আজ দারুন ভাবে দু'জনের আলোচনায় এসে যায়। আমার চোখ ছুঁয়ে যায় দরীর অশ্রুসিক্ত দু'চোখ। যে চোখে একদা শুধুই ছিলো হাসির আনন্দ ছটা, সেখানে আজ এ অশ্রু বড়ই বেদনাদায়ক। ধর্ম, বর্ণ, সমাজের আগল ভাঙ্গার একটি ইচ্ছে আমাদের মাঝে এক সময় প্রবল ছিলো। মন্দোদরী সে ইচ্ছায় অনড় থাকলেও আমার ভীরুতার জন্যে সব কিছু ভেস্তে গিয়েছিলো।

আজ আবার ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠতে চাইছে। ইচ্ছে করছে যে যা বলুক সকল অতীত ছুড়ে ফেলে আমরা একাকার হয়ে যাই। আমি আমার ইচ্ছেটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করি, দরী আমার মনোভাব টের পেয়ে সযত্নে এড়িয়ে যেতে থাকে। এই দরীর জন্যে এক সময় আমি কবিতে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। অন্তর দিয়ে না হলেও, পোষাক পরিচ্ছদে কবি হয়ে ছিলাম। আঙুলের করে গুণলে আমার কবিতা লেখালেখির বয়স বছর তিরিশ। কবিতার লাল ফাঁদে পড়েছিলাম হয়েতো তারও একটু আগেই। সেসময়টা ঝাপসা হয়ে গেছে স্মৃতিতে। সময়টাকে ঠিক প্রস্তুতি পর্বও বলা যাবে না। বরং আমি সরব ছিলাম মৃদু রাজনীততেই। বামধারার রাজনীতির প্রচন্ড স্বপনুময় জালের রৌদ্রেজ্জ্বল ঝলাকানির মধ্যে শৈশব পার হয়ে বহির্মুখী কৈশোরক মুগ্ধতায়, এক সময়, যখন সামাজিক দায়, শ্রেণীগত শোষণ,

আন্তর্জাতিক সম্পর্কসূত্র এবং আর্থবৈষায়িক বিষয়াদি প্রথম প্রেমের মতোই ভালোবেসে ফেলছি, তখনই, যৌবনের নিঃসঙ্গতার প্রথম। সিঁড়িতে পা রাখার মুহূর্তে , এক কিশোরীর কুহকী প্রেম আমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিলাম তার তীক্ষ্ণ নখে। আর সেই নখ-বেঁধা রক্তক্ষরিত অবস্থা থেকে অতাল্পদিনের মধ্যেই আমি আমার ব্যক্তিগত ঝঞ্ঝায় ওকে সাথী করে নেই। প্রথমে তুমুল আত্মনির্জনতায়, কবিতার আসল খপ্পরে পড়ি আমি,কবিতার মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকি যৌবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত । এক সময় কবিতার রং ফিকে হয়ে আসে। জীবন ছন্দময় কবিতাকে গদ্য কবিতায় রূপান্তরীত করে। আমার সকল কবিতার নারী, রমনে সম্ভোগে, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে মন্দোদরী এই ব্রাহ্মণ কন্যার রাগ-অনুরাগ চকিত চুম্বন আমাকে সোনালী কৈশোরে নিয়ে যায়।

আমি ভুলে যাই এরই মধ্যে পৃথিবীর বয়স বেড়েছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরও। মানুষ যা চায় তা কি পায়? যা পায় তা কি সকল সময় কাম্য? দরীর স্বামী সন্দেহ বিষে আক্রান্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে করতে একদিন সুঁতোটাই ছিন্ন করে দিলো। প্রায় চার বছর দেখা শুনা নেই ওদের। একমাত্র মেয়েটি বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রী। ছেলেটি প্রি-কেডেটের। দুজনই রাজধানী শহরে থেকে পড়াশোনা করে। ওদের ভরণ পোষণ শিক্ষা ব্যয় সব কিছু মাকেই বহন করতে হচ্ছে। দরী অনেক বিষাদের মধ্যে একটু হেসে বললো ছেলেটি ঠিক তোমার মতো হয়েছে। ওর মাঝে আমি আমার হারিয়ে যাওয়া প্রেমকে খুঁজি, জান বলে ডাকি। চোরা চাহনিতে আমাকে দেখালো দরী। আমার প্রতিক্রিয়া ও কি টের পেয়েছে। একজন সুন্দর স্বামী চেয়েছিল দরী; পেয়ে সে কি সুখী হতে পেরেছিলো? মন্দাদরীর গানের গলা ছিল খুব মিষ্টি।

স্কুলে আবৃত্তি করে পুরস্কারও পেয়েছিল। দেখতে খুব সুন্দরী ছিল বলে স্কুলের একটা নাটকে নায়িকার চরিত্রটি দেওয়া হয়েছিল ওকে। অভিনয়ও করেছিল খুব ভালো। এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জীবনটাকে সাজাতে পারলো না। ভালোবাসার প্রতি সকল সময় একনিষ্ঠ ও সৎ ছিলো। প্রেম ভালোবাসার সকল বিষয়ে ওর একাগ্রতা ছিলো নিখাদ। নিয়তি বলে একটা শব্দকে বিশ্বাস করতে হয় দরীকে দেখলে। কি নেই ওর, তারপরও কাঙ্খিত প্রাপ্তি থেকে হয়েছে বঞ্চিত সে। কিন্তু কেন? তার তো কোন দোষ ছিলো না। নিয়তিই তাকে এমনি এক নিরুত্তাপ জীবনে ঠেলে দিয়েছে। তার সাহসী প্রেমিক পুরুষটি হঠাৎই ভীরুতে পরিণত হয়। অথচ হৃদয় সকল সময় ছিলো সাহসী। দরীর আবাস থেকে যখন ফিরলাম তখন শুধু মনে হলো ওকে ভুলি কেমনে? আমার শত জনমের সাথী, দরীর সাথে দ্বিতীয় বার যখন দেখা, তখন স্বকীয়তা রূপান্তরিত হয়েছে পরকীয়ায়। দরীর সব কিছুতেই আমি বেদখল। দখলীসত্ত্ব অন্য কারো কাছে হস্তান্তরিত। এত কিছুর পরও মন বলে একটা কথা। আমি আমার মন থেকে ওকে এক মুহূর্তের জন্যে আড়াল করতে পারিনি। বহু বছর পর যখন দেখা হলো, তখন প্রথম প্রথম নীতিকথা, সমাজ লৌকিকতার ভয় ইত্যাদি কারণে একটা দুরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলাম দু'জনই। সময়ের ব্যবধানে আবার জোড়া লাগতে শুরু করলো পুরোণো সম্পর্কে। আমার আর দরীর মাঝে দাম্পত্য সম্পর্কের সকল কিছুই বহাল হয়ে গেল এবং তা কারো অনুমতি না নিয়েই।

হেমন্ত ক্ষয়ে গিয়ে শীত শুরু হয়েছে। আমরা আগের চেয়েও বেশি কাছে চলে এলাম, পাশ্চাত্যে হয়তো এই সম্পর্কটাকেই 'লিভ টুগেদার' বলে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় 'লিভ টুগেদার' অনুমোদন করে না। সেঁজুতির কাছে বিষয়টি গোপন রইলো না। কিন্তু সে তার নামের সার্থকতা রক্ষা করে সন্ধ্যার প্রদীপ হয়েই রইলো। খুব একটা জোরালো প্রতিবাদ করলো না। গড়ে তুললো না কোন প্রতিরোধ। পড়ন্ত বিকেলে সকালের সোনালী রোদের উত্তাপ সঞ্চারিত হলো। কবোষ্ণ তাপের উষ্ণতা দারুন ভাবে উপভোগ করতে থাকি আমরা।

আজ কয়াশা পড়েছে বেশ। একটু দুরের অন্ধকারে বাগানে পাঁচিলের ধারে ঝাঁকড়া গাছগুলোর গায়ে চাপ চাপ কুয়াশা। কুয়াশা পড়ে পিচঢালা কালো রাস্তাটাকেও রহস্যময় করে তুলেছে। সুনসান রাস্তাটা হাল্কা থেকে ক্রমশ গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। চারদিকের সকল কিছু গুছিয়ে রেখে শোবার ঘরে এলো মন্দোদরী। বিছানা করে মশারী টাঙ্গালো এবং গুটিয়ে রাখলো খাটের স্ট্যান্ডে। আজ আর বাড়ি ফেরার তাড়া অনুভব করছি না। অনেক না বলা কথার কথকতা শেষ হতেই, ঘরের বাতি নিভে গেলো। নিশুতি রাত তার শীরে ধারণ করে অনেকের মতো দরী আর হৃদয়কে। নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে ওরা।

হাড় ভেঙ্গে গেলে, অপচিকিৎসা বা চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় যেমন করে অসামঞ্জস্যভাবে জোড়া লাগে তেমনি। ওদের সম্পর্কটা তেমনি জোড়া লেগে গেল। কিন্তু ভাঙ্গা হাড় যেমন জোর পায় না, আমরা দুর্বল অবস্থানে থেকেই জীবনটাকে টেনে নিচ্ছি। আমার দিন গড়িয়ে রাত খাওয়া দাওয়া সেরেছি রাতের প্রথম প্রহরে। ওকে বললাম বাসায় ফিরবো না। ও বলল জানতাম। ইচ্ছে করলে এখনই শুয়ে পড়া যায়। শুলাম না। দু'জনে দুটো চাঁদর গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারে এসে বসলাম। বাইরে এখন যথেষ্ট শীত- একে অপরকে জড়িয়ে রাখলাম দীর্ঘক্ষণ। এ বয়সে কামনার তাড়া নেই, শুধুই সান্নিধ্য-আঙ্গুর লতা যেমন জৈবিক কোন কারণ ছাড়াই, পাশের গাছটিকে অবলম্বন করে জড়িয়ে থাকে। তেমনি আমায় জড়িয়ে আছে দরী। এমন করেই আমৃত্যু জড়িয়ে থাকার কথা ছিলো। রাতের শেষ প্রহরে আমরা ঘরে ফিরে আসি। উনিশ'শ উনাশি, গত বন্যার কারণে এবার শীত পড়ছে বেশি।

বগুড়া শহরের বাইরে গিয়েছিলাম, গাবতলী উপজেলা। শহরের কাছাকাছি এসেছি, দেখি ভরা রোদে ও দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো দপ্তরের কোন কাজে এসেছে। আমি আমার মটর বাইকটি নিয়ে ওর কাছে গেলাম। আজ সকালে খুব কুয়াশা পড়েছিলো। রোদ তেমন চড়া না হলেও সুর্য ওঠার পর শীত পালিয়েছে তাই উত্তাপ খুব বেশি মনে হচ্ছে। ঘড়ির কাটা এগার ছুঁই ছুঁই। আমি আমার 'জান' এর দিকে কত সময় তাকিয়েছিলাম মনে নেই, ইশারা করতে হলো না। চুম্বকের অদৃশ্য টানে দরী এগিয়ে এলো। কোন কথা বললো না শুধুখানিক চেয়ে দেখল। কুশল বিনিময় বা কিছু বলার আগেই ও উঠে বসলো মটর সাইকেলের পেছনে খালি সীটে। কোন কথা না বলে গাড়ি স্টার্ট দেই আমি। সিদ্ধান্তহীন এবং ভাবুক যুগলের মতো ঘুরে বেড়াই সদর রাস্তা ধরে অনেক পথ। আমাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে আছে দরী। ওর সম্পূর্ণ শরীরের ভার এখন মটর বাইক ছাপিয়ে আমার শরীরে সমর্পিত। আমি বহু বছর আগের একটি দিনে ফিরে যাই। মটর সাইকেলের জ্বালানী ফুরিয়ে এসেছে, আমরা চলে আসি পথের পাশে রেস্তোরার কাছে। এতক্ষন ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলেছিলাম। শুধুই প্রিয় সান্নিধ্যে বিরামহীন পথ চলা। কত কথা কত আনন্দ স্পর্শ আর সোহাগ। দরী বললো চলো কিছু খেয়ে নেই। ওর আগ্রহে প্রবেশ করলাম 'মায়াকানন' রেস্তোরায়। চত্বরে মোটরসাইকেল রেখে দ্রুতপায়ে সিড়ি ডিঙাই। সর্তক প্রহরার চোখ দায়িত্ব পালনের অভিপ্রায়ে একনিষ্ট। আমার হাতে লাল হেলমেট। দরীর পরনে নীল প্যান্ট ডোরা কাটাসার্ট বিদেশী এনজিওতে চাকুরী, তাই স্মার্ট হয়ে থাকতে হয়। আমার পরনে জিন্সের কালো প্যান্ট এবং সাদা শার্ট এই ইউরোপীয় পোষাকের আড়ালে তখনও আমরা গ্রাম্য মানসিকতার দু'জন মানব-মানবী। ওর পছন্দের পারফিউম এখনও আমি ব্যবহার করি।

এখন বাইরে তপ্ত দুপুর। রেস্তোরার কক্ষটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। নেশা ধরানো সুরের মতো বাদ্য বাজছে রেস্তোরার ডেকসেটে। সুরটা জঙ্গালের ধারের মত্ত ডাহুকের ন্যায়। গ্রাম্য লোকালয়ের পুকুরের ধারে কচুরী পানার অপর পাড়ের ডাহুকীকে আহ্বান করছে কামনাতুর ডাহুক। দু'জন তরুণী বারান্দায় দাঁড়িয়ে গল্প করছিলো। স্বপ্নকাতর একজন তরুণের এলোমেলো বিষন্নতা চোখ পড়ার মতো। আমার হৃদস্পনন্দন

অনুভব করতে ব্যর্থ হচ্ছে কি দরী? আমরা একটা পর্দা ঘেরা সুন্দর সজ্জিত কেবিনে এসে বসি মুখোমুখি। অসম্ভব এক বিনয়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে দরী। এরকমও বলা যায় যে, সেই মানুষটির দিকে তাকায় দরী যার সৌন্দর্য বিমূর্ত ছিল ওর মায়াবী অন্তরে। কোন কথা নয়, - আগের মতোই দরী হাত রাখে হৃদয়ের হাতে, দীর্ঘদিন পর হৃদয় ছুঁয়ে দেখ প্রিয়তমাকে ওঠে এসে একজন অপর জনের পাশে বসে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ উষ্ণ হয়ে ওঠে মুহূর্তেই।

কোন শব্দ নেই, শুধু দু'জনের তপ্ত শ্বাস প্রশ্বাস তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। দরীকে জড়িয়ে থাকি অনেক্ষণ। ক্ষিদে অনুভূত হয়েছিলো বলে ''মায়াকাননে'' এসেছিলাম দু'জনে। এখন সে কথা ভুলে গেছি। জড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে। তারপরও বাস্তবে ফিরে আসতে হয় দু'জনাকেই। দরীর বুকভরা না পাওয়া হুতাসের কথা মনে থাকে না। অসি যেমন কালিকে জাগায় তার স্পর্শ দিয়ে।

অবিনাশী এক স্পর্শে মেতে ওঠে ফুলের সৌরভ। নীতিকথার পরাজয়ের মালা ঝুলে থাকে এখানে সেখানে। দরীর শরীর পরিপাটি ঘাসের মুগ্ধতায় আমাকে জড়িয়ে রাখে। যে ঘাস, নীল দেখে, আকাশ দেখে দায়িত্বের নিষ্পেষণে নিজেকে সমর্পণ করে। ওর শরীরে সুরসুড়ি আবিষ্কারের প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে হৃদয়ের। কি অপূর্ব শিহরণ সে দিন বয়ে ছিলো ওর সমগ্র সত্তা জুড়ে। বিধাতার সবচাইতে মুল্যবান আশীর্বাদ আবিষ্কার করে পরিপূর্ণ হয়েছিলো দু'জন। মানুষে মানুষে প্রভেদ, ঐশ্বর্য, অর্থবিত্ত সর্বশেষ ধর্ম প্রকৃতি ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পর প্রেম তার সরল সহজ পথ হারায়।

এভাবেই সময় বয়ে যায়। রংধনু, তরঙ্গ অথবা মাছের বুদবুদ পৃথিবীতে কোনোভাবেই স্থির হয় না। কিংবা এই যে শিশু, যে তার প্রিয় পুতুল হারিয়ে পৃথিবী হারানোর অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তার অভিমানও ক্ষণস্থায়ী হয়ে যায়। খানিক পরে ওয়েটারকে খাবারের আদেশ দিয়ে বলি দরজাটা ভালো করে টেনে দাও। গভীর আবেগে আমরা পরস্পরের অধরকে একই বিন্দুতে আনি। এর রূপ আত্মসমর্পণের ক্ষণটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানব জীবনের নানা ইমোশনের বহুস্তর। যৌবনের নানা মাত্রা। যৌনতার বহুতর তরঙ্গ। স্নেহের উচ্ছাস, হৃদয়ের ঝড়। চুমু নামক বিষাদ ফোটানোর এই স্বর্গীয় ভাষা কখন মানব মানবী আবিষ্কার করেছিলো আমার জানা নেই। ছোট নরম নিঃশব্দ বিপ্লব, একান্ত নিভৃতে দরীকে আমার আগ্রাসী সত্ত্বায় বিলীন করে দেয়। ওয়েটার এসে বিনম্র উপস্থিতির জানান দেয়। আওয়াজ করে টুক টুক। তারপর খাবার দিয়ে যায়, আমরা ভুলে যাই খাবারের কথা। যৌবনের জোয়ার আর তার জয়গান এখন আমাদের কাছে মুখ্য। কতক্ষণ এভাবে কাটলো বলতে পারবো না। আমার মনে প্রবল ইচ্ছে যদি আর কখনো আমরা বিচ্ছিন্ন না হতাম। তাহলে মন্দ হতো না। ঈশ্বরের কাছে এখন আর আমার কিছু চাওয়ার নেই। এমন মনে হলো। মনে হলো পৃথিবীতে সবচাইতে বড় সৌভাগ্যবান আমরা দু'জন।

সত্তর দশকের মধ্যভাগ। কলেজ ফেরত আমি ঘরে ফিরেছি। আঁধার রাতের আলো হয়ে নিজের ঘরে অপেক্ষা করে আছে দরী। কুয়াশার ঘন চাঁদর জড়িয়ে আপন খেয়ালে বয়ে যাচ্ছে রজত রেখা নদী। দরীদের ঘরের পাশের কালো কালো গাছগুলো যেন ফিস ফিসিয়ে কথা বলছে। দরজায় টোকা পড়তেই বেরিয়ে এলো মন্দোদরী। জোনাকিরা আলো জ্বেলে রেখেছে ঘরের বাইরে। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে রাতে চড়া পাখিরা জেগে ওঠে নড়ে চড়ে শব্দ করে। হাওয়ার গন্ধে বন্য পেলবতা। স্পর্শে ক্ষণিকের শিহরন। কন্যা এখন যুবতী, ছোট ঠাকুর বাড়ির বাগানের মাটির শয্যা ফুলে ফুলে ঢাকা। উদাস হাওয়া কতক্ষণ থেমে ছিলো মনে নেই। দু'ঘরে দু'জন ফিরেগেলাম পরিতৃপ্ত। ভুলে গিয়েছিলাম বাগানের মাটির শয্যায় বিছানো গায়ের শুভ্র শালটির কথা। বাড়িতে ফিরে দেখি শালে প্রচুর দাগ।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরী বলে, আজ একবারেই না পাওয়া সব পাওনা শোধ করে দিতে হবে? হৃদয় তুমি পুর্বের মতো আগ্রাসী রয়ে গেছো। তুমি চলে গেলে আমার রাত গুলো যে কাটে না, দিন গুলো হয় ব্যাথাতুর। তুমিতো ফিরে যাও ঘরে সেঁজুতি! আমি কি করি তুমি আমায় শেষ করে দিয়েছো। ও সখা সহিতে যে ঘরে পারি না। ওর দীর্ঘশ্বাস আর তপ্ত নিঃশ্বাস, আমাকে কষ্টের সমুদ্রে ঠেলে দেয়। আমি অতীতের দুঃখ আর বেদনা গুলোকে এই আনন্দ মুহূর্তে সামনে আনতে চাইনা। এখন আনন্দ শুধু আনন্দ চাই। আমি আর হারতে বা হারাতে চাই না। উপভোগের পেয়ালা কানায় কানায় পুর্ণ করতে চাই। সুমনের মতো আমার বলতে ইচ্ছে করে 'আমি তোমাকেই চাই। অকাল বোধনে আমি তোমাকেই চাই।' তিন চার ঘন্টা কখন শেষ হয়ে গেলো বলতে পারবো না। দরীকে জানালাম সেজুঁতি ঢাকা ফিরে গেছে, কোন বাঁধা এখন নেই।

খাবার খেয়ে ওকে পোঁছে দিলাম ওর আবাসে। আবার সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। সারারাত কাটা ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে কাটল আমার। সারা সত্তায় দরীর স্পর্শ । ভাবতে না চাইলেও ভাবনাটা ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে আসছে। কাল কি আবার ওকে ফিরে পাবো। গতকাল দরী বলেছিলো, দেখো জীবনটা দুর্বাঘাস নয় যে ইচ্ছে হলে মাড়ালে। ওর চোখ তখন শক্ত হতে হতে জমতে থাকে সিমেন্টের মতো। ওর আর দোষ কি, কেননা প্রেম করব অথচ বিয়ে করব না এটা কেমন পাগলামি? পুর্ব স্মৃতি স্মরণ করলেই দরীর মাথায় রাগ চাপে অভিযোগ করে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছ তুমি। তোমার কমিটমেন্ট ছিল। যা তমি ইচ্ছে করে ই-ভঙ্গ করেছ। উত্তেজনায় দরী ভাষা হারায়, আমি তখন শান্ত থাকি । সে রাতে আর ঘুমাতে পারলাম না। ভোর হতেই ছুটে গেলাম দরীর বাসায়। ওর অবস্থাও আমারই মতো।

ওকে বললাম রাতে তৈরী থেকো 'মায়া কাননে' যাবো দরী না করল না। রাতের খাবারের জন্যে আমরা সাড়ে আটটা নাগাদ মায়া কাননে এলাম। খাবার শেষে ওয়েটার চা দিয়েছে। সে চায়ে চুমুক দেয়, হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। তখন কিছু সময়ের জন্য সামান্য নীরবতা নেমে আসে এবং কে একজন চার্জ লাইট খোঁজে। প্রচন্ড উত্তেজনা দরী রেগে আছে। স্পষ্ট করে বলে আমাকে ছোঁবেনা। খবরদার হাত বড়ালে ভালো হবে না। আমি আমাকে ধরে রাখতে পারি না। আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গো যায়। অশালীন ব্যবহারের চর্চা চলে কিছুক্ষণ। দরী বলে, 'প্রমিজ' করে ভাঙাটাই হচ্ছে তোমার একটা রেওয়াজ।

সিদ্ধান্তের পেছনে যে কোনো যুক্তি দাড় করাতে ও তোমার জুড়ি নেই। সে সিদ্ধান্ত যতই নির্মম হোক। নতুন করে সর্ম্পক গড়তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে দরী এবং বলে প্রেম কি সময় কাটানোর একটা কৌশল মাত্র? অথবা বিনোদন? এসবের কোন উত্তর জানা নেই আমার। তারপরও কাটানো সময় গুলোকে মনে হয় মধুর, যা ঈশ্বর প্রদত্ত। আমার প্রেয়সী ফাঁকা বুলিতে নিজেকে আর জড়াতে নারাজ। কি করব আমি বুঝতে পারি না। একবার ভাবি সেজুঁতির সাথে সম্পর্কটা শেষ করে দেবো, কিন্তু দরী চন্দ্রা আর অনির্বানের মনে করিয়ে দেয়। শর্মিষ্ঠা আর শুভ্র প্রসংগ ও এসে যায়। দলী বললো একদিন যে পথ ছিল সহজ সরল বাধা বিপত্তিহীন, এখন তা সর্পিল মায়া জালে জড়ানো।

না-কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। আমি পরকীয়াকে স্বকীয়ায় রূপান্তর করতে ব্যর্থ হই। দু'জন মানুষ দুরকম সিদ্ধান্তে একনিষ্ঠ। পারস্পারিক বিশ্বাস ত্যাগ, আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে, আমি ভাবতে পারি না। কিছু কিছু মানুষ আছে এদের মধ্যে মনকাড়া স্নিগ্ধ বিকেলেও বিষন্নতা থাকে। অকারণে ফুল ছিড়ে ফেলে অথবা ফুটপাতে ময়লা ফেলতে ফেলতে দ্বিধাগ্রস্ত হাটেঁ তারা। আমার বর্তমান অবস্থাও কি সেরূপ? একদিন এক হেমন্ত সন্ধ্যায় নরম আবেশে দরীর স্পর্শ পেয়েছিলাম আমি। ওর চোখে তখন ছিলো স্বচ্ছ পানি সে পানি প্রাপ্তির, আবেগের। আজ সব কিছুই বদলে গেছে। প্রকৃতি, প্রেম অথবা উপলব্ধি। বিদায় বেলায়

অনেক কষ্ট করে দরীর কাছে কাল আবার দেখা করার আশ্বাস চাইলাম, ও হ্যাঁ করলো। সেই আশ্বাস টুকু সঙ্গো করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম আমি।

ঘরে ফিরে বুঝতে পারলাম একটা কিছু হয়েছে আমার। এত বুক কাঁপছে কেন? কে জানে? হাত পা অবশ অবশ, গলা বুক থেকে শুকিয়ে উঠছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আমার। আমি আমার আর দরীর সম্পর্কটাকে এ যাবত পৃথিবীতে আবিস্কৃত সম্পর্কের কোন সংজ্ঞায় ফেলতে পারছি না, বিফল হচ্ছি বারে বারে। ন্যায় অন্যায় আর পাপ অপাপের দোলা চলে দুলছি দু'জন। অপ্রাপ্তির বেদনা, পিছনে ফেলে আসা প্রাপ্তির আনন্দের সাথে নিক্তিতে চড়ে বসলো। বাইরে তাকাতেই দেখলাম নতুন একটি প্রভাত কথা বলতে শুরু করেছে। হলুদ লাল সাদা ও সবুজের মিশ্রণে সে প্রভাতের আলো যা তখন খুবই সুন্দর। রঙীন আলোর বিচ্ছুরণস্নাত চির গাঢ় সোনালী যৌবন কথা বলতে শুরু করেছে। যৌবন ন্যায় অন্যায়ের প্রাচীর ভাঙ্গাতেই উদগ্রীব। যৌবনের তেজে নিজের উৎকণ্ঠিত, টেনশনগ্রস্থ, আত্মপ্রকৃতি আজ ব্যাপ্তি খুঁজে পেতে চাইছে দরীর আশ্বাসের মাঝে। আবার দু'টি পরিবার, অনেকগুলো মানুষের উপস্থিতি,অস্তিত্ব আমাদের মাঝে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিপুল বিপন্নতায় আমরা আজ পতিত।

এই বিপন্নতা থেকে উদ্ধার পাবো কি করে সে রাস্তা আমাদের জানা নেই। তাই বাঁকা পথই এখন সম্বল। আজ উদ্বেলিত হৃদয়ে শুধুই উদ্বেগ কতদিন সম্পর্কটা এভাবে চলতে থাকবে। সম্পর্কের স্থায়িত্ব নিয়ে দরী-হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। দরীর স্বামী হীরক বিদায় নিয়ে চলে গেছে বেশ ক বছর আগে। সেজুঁতির তেমন কোন অপরাধ নেই। নতুন প্রজন্মের দু'জোড়া ছেলে মেয়ে ওরা নিরপরাধ ওদের ফেলে কোথায় পালাব আমরা।

বগুড়া শহরের 'ইটের পাজঁরে লোহার খাঁচার' দালানে শুয়ে, প্রহর গুণতে গুণতে মনে পড়ে যায়, আমার আর দরীর ছোট বেলার, সোনারং গ্রামে নিমগ্ন নির্জন সর্পিল মেঠো পথের কথা। সেদিন কি কোন ন্যায় অন্যায় ছিলো? তৃষ্ণা পেয়েছে পানি। খাবার জন্যে শয্যা ত্যাগ করি। প্যান্টের পকেটে মানিব্যাগের মধ্যে সযত্নে লুকিয়ে রাখা দরীর ছবিটি বের করি, ছবিটি সমুদ্র হয়ে যায়। স্থবির সমুদ্রটা সাঁ সাঁ হাই তুলে ছড়িয়ে পড়ে এদিক সেদিক। একটা স্বপ্ন তার কপাট খোলে সঙ্গোপনে, সুপ্রভাত অথবা গল্পের তরুণ-তরুণী চা খায়, ক্রিপসে কামড় দেয় মচমচ, এটা সেটা বলে।

জীবনের গল্প এগুতে থাকে অন্য এক পথে, আমি হৃদয় চৌধুরী পেরিয়ে এসেছি অনেক পথ। শৈশব, কৈশোর, যৌবন জীবনের পাঁচ অদ্যায়ের আর মাত্র দুটো বাকী। কিছুদিন পর একটি জীবন চক্র সম্পূর্ণ হবে। রজত রেখা থেকে শুরু করে করতোয়া হয়ে ডাহুক নদীর তীর অনেক পথ। মাঝে কতশত নদী পাড় হয়ে এসেছি। দরী আর আমার যাত্রা শুরু হয়েছিলো সে পথে, যে পথটা ছিল কাশফুলে ঢাকা নদীর তীর সংলগ্ন। পথ চলতে চলতে তরুণ-তরুণী হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে প্রকাশ করে ভিন্ন অর্থে। ফাঁকা ফুটপাতে ফুটফুটে এক শিশুকে হাঁটতে দেখে ওরা খুশি হয়ে যায়। ওরা ওদের গোপন বোধকে সংযত করে অপেক্ষা করে যামিনির অথবা আঁধারের। যৌবনে লুকিয়ে রেস্তোরায় চায়ের বিল পরিশোধের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

একদিন বৃষ্টিঝরা এক সন্ধ্যায়, পুর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই ছেলেটি একটি বাড়ির সামনে এসে অকস্মাৎ থেমে যায়। বাড়িটিকে দেখিয়ে বলে ওই যে, বাড়ি ওখানেই জীবন শুরু করব ভাবছি। কি মিথ্যে আশ্বাস! কুহেলিকা ! এর পরও মেয়েটি ছেলেটির সঙ্গী হয়। দুর্মর যৌবন ভবিষ্যৎ চিন্তাকে স্বচ্ছ পথে চলতে দেয় না। ছেলেটির বানোয়াট আশ্বাসে মেয়েটি তখন বিভোর। ছেলেটি তখন মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে শরীর চায়,

ভালোবাসাকে একটা খোলসে আবৃত করতে করতে কেবলই শরীর ছোঁয়ার রপ্ত অভ্যেসের মহড়া দেয়। সৈন্য দলের শীতকালীন বা গ্রীষ্ম কালীন মহড়ার মতো ছেলেটি একাগ্র ও নির্ভিক। ছেলেটি একসময় আগ্রাসী হয়, পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়া বেয়ে কামনার শিখরে ওঠে।

চলবে....